বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত।

শ্রীযুক্ত মার্শমান সাহেবের রচিত

গ্রন্থহইতে অনুবাদিত।

MARSHMAN'S HISTORY OF BENGAL

IN BENGALI.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS, AND SOLD
AT THEIR DEPOSITORY CIRCULAR ROAD.

1858

বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত

১ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের যে প্রদেশের লোকেরা লিখনে ও কথনে বঙ্গভাষা ব্যবহার করে, সেই প্রদেশের নাম বঙ্গদেশ কিম্বা বাঙ্গালা দেশ। তাহার দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা বন ও পর্ব্বত, পশ্চিম সীমা হিন্দুজাতি ভিন্ন নানা অসভ্য পর্ব্বতীয় জাতির বাসস্থান। বোধ হয় বঙ্গ দেশে প্রায় তিন কোটি মনুষ্য আছে।

অতি পুরাতন কালে বঙ্গদেশের কি অবস্থা ছিল তাহা নিশ্চয় করা অতি দুষ্কর, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম কোন্ সময়ে চলিত হইতে লাগিল তাহা জানা যায় না। যে মনুষ্যেরা প্রথমাবধি তদ্দেশে বাস করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু ছিল না, কিন্তু পশ্চিমসীমাস্থিত পর্ব্বতীয় লোকদের তুল্য এক জাতি ছিল; পরে মুহম্মদীয় ধর্ম্মমত যেমন যবনদের আগমনদ্বারা দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তদ্রূপ হিন্দু ধর্ম্মমত ব্রাহ্মণ লোকদের আগমনদ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল, এমন অনুমান হয়। আর যে বঙ্গভাষা এখন চলিত আছে তাহা কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইল, ইহাও নিশ্চয় করা আমাদের অসাধ্য। সংস্কৃত ও আরবি ও পার্সি শব্দ ভিন্নও অন্য ২ অনেক শব্দ সেই ভাষাতে চলিত আছে, তাহাতে অনুমান হয় অতি পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ নিবাসি লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার সংস্কৃতাদি ভাষার

অক্ষিত কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু সেই পুরাতন ভাষা এখন নষ্ট হইয়াছে। বঙ্গ ভাষা লিখনার্থে যে সকল অক্ষর চলিত আছে, তাহা প্রায় দেবনাগরি অক্ষরের তুল্য, কেবল তাহার আকৃতির কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে।

আড়াই সহস্র বৎসর হইল গৌড় নামে নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা কেহ২ কহে; এবং বঙ্গদেশের সকল নগরের মধ্যে প্রথমে সেই নগরের পত্তন হইয়াছিল, এমন বোধ হয় বটে, আর তাহার নামানুসারে কখনো২ সমুদয় বঙ্গদেশকে গৌড়িয়া কিম্বা গৌড় দেশ বলে। ঐ গৌড় নগর বঙ্গদেশের উত্তরভাগে ছিল। পূর্ব্বভাগের সুবর্ণগ্রাম কিম্বা সোণার গাঁ নামক রাজধানী বর্ত্তমান কালের ঢাকা নগরহইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে ছিল। বঙ্গদেশের সেই পূর্ব্বভাগে যে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনা যায়, তাহার সুখ্যাতি অতি পূর্ব্বকালাবধি পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়াতে আঠারো শত বৎসর হইল ঐ বস্ত্র বাণিজ্যপথে অতি দূরে ইউরপের মহানগর রোমা পর্য্যন্ত নীত হইত; কারণ রোমীয় লোকেরা তাহা অতি বহুমূল্য রূপে মানিত, এবং বাঙ্গালা শব্দের অনুসারে তাহার নাম কার্পাস রাখিত। যে নৌকাদ্বারা ঐ বাণিজ্য হইত, তাহা ঐ সূক্ষ্ম বস্ত্র লইবার চেষ্টাতে সমুদ্রহইতে পদ্মা নদী দিয়া উঠিয়া সুবর্ণগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিত, এমন অনুমান হয়।

বঙ্গদেশের পশ্চিমভাগের সপ্তগ্রাম কিম্বা সাতগাঁ নামক রাজধানী এখনকার হুগলি নামক স্থানের নিকটে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ উত্তরে ছিল। রোমীয় লোকেরা তাহার নাম জ্ঞাত ছিল, এবং পুরাণেতেও তাহার কোন২ কথা লিখিত আছে। ঐ স্থান পূর্ব্বে অতি খ্যাত বাণিজ্যস্থান

ছিল, কারণ যে সকল দ্রব্য সমুদ্রপথে বঙ্গদেশে আসিত, তাহা প্রায় সকল তথায় আনীত হইত। পূর্ব্বকালীয় গৌড় ও সোণারগাঁ ও সাতগাঁ নামে তিন রাজধানী কালক্রমে বিনষ্ট হওয়াতে এখন কাঁৎড়ার চিহ্নিমাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

দেড় সহস্র বৎসর হইল বঙ্গদেশ মগধ রাজ্যের অধীন হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ মগধদেশের নাম দক্ষিণ বেহার, এবং পালিবথ্র কিম্বা পাটলিপুত্র নামক যে নগর তাহার রাজধানী ছিল, তাহার নাম পাটনা হইয়াছে, এমন অনুমান কেহ২ করিয়াছে। মগধ রাজ্যের নাশ হইলে পর বৌদ্ধ মতাবলম্বি পাল নামক রাজবংশ বঙ্গদেশের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল, কিন্তু সমস্ত দেশে তাহাদের অধিকার ছিল কি না, তাহা নিশ্চয় করা যায় না। অদ্যাবধি মহীপাল দীঘী নামে যে এক বৃহৎ সরোবর দিনাজপুর জেলাতে আছে, তাহাই উক্ত পালবংশীয় প্রথম রাজার একটি স্মরণার্থক চিহ্নস্বরূপ। পাল বংশের পরে বৈদ্যজাতীয় সেন বংশ রাজত্ব করিতে লাগিল, সেই বংশের পরে বঙ্গ-দেশে আর কোন হিন্দু রাজবংশের অধিকার হয় নাই।

সেন বংশের পুরাবৃত্ত অতি দুর্জ্ঞেয়। হিন্দু লোকেরা বলে, তাহার আদিপুরুষ আদিশূর নামা ব্যক্তি ইংরাজি ১০৬৩ শালে রাজত্ব করিলেন। তৎকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় আট শত বৎসর গত হইয়াছে। কোন২ লোকের অনুমানে বৌদ্ধ মতাবলম্বি পালবংশের অধিকারসময়ে বঙ্গদেশীয় সকল ব্রাহ্মণ নষ্ট হইয়াছিলেন, অন্যদের অনুমানে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ধর্ম্মকর্ম্ম অজ্ঞাত প্রযুক্ত আদিশূর রাজার অসন্তোষ জন্মাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আদিশূর কান্যকুব্জ রাজ্যের নৃপতির নিকটে লোক পাঠাইয়া শাস্ত্রজ্ঞ পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিলেন। তাঁ-

হার এই প্রার্থনানুসারে যে পাঁচ ব্রাহ্মণ পাঁচ ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া তথাহইতে উপস্থিত হইলেন, সেই পাঁচ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ, ও তাঁহাদের পাঁচ ভৃত্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থদের আদিপুরুষ হইয়াছেন।

পুরুষপরম্পরাগত বাক্যানুসারে আদিশূরের ঔরসে বল্লাল সেন জন্মিলেন, কিন্তু অল্পকাল হইল বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগে ভূমিতে পোঁতা একটি পুরাতন তাম্রপত্র পাওয়া গেল, তাহাতে যে লিপি বৈদ্য বংশের অধিকার সময়ে খোদিত হইয়াছিল, তদনুসারে বল্লাল সেনের পিতার নাম বিজয় সেন, এবং আইন আকবেরী নামক পুস্তকানুসারে তাঁহার নাম সুখ সেন ছিল। আর বল্লাল যে আদিশূরের পুত্র নহেন, তাহা সপ্রমাণ বটে, যেহেতুক আদিশূর যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জহইতে আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানাদি বংশ বল্লাল সেনের অধিকার সময়ে অতি বহুসংখ্যক হওয়াতে বল্লাল সেন তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া কৌলিন্য পদের সৃষ্টি করিলেন। এক রাজার অধিকার সময়ে পাঁচ জন কেমন করিয়া এত বহুবংশ হইতে পারে? অতএব আদিশূর বল্লালের পিতা না হইয়া তাঁহার পূর্ব্বকালীয় কোন বংশজাত ছিলেন, এবং বল্লালের প্রকৃত পিতা বিজয় সেন উক্ত রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন, আমরা এমত সিদ্ধান্ত করি।

অপর ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রাহ্মণের দেহ গ্রহণ করিয়া ঐ বল্লালের পিতা হইলেন, এমন এক কল্পিত বাক্যও আছে। সে যাহা হউক, বল্লাল সেন অতি পরাক্রান্ত হইয়া পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত আপন জন্মভূমি বঙ্গদেশের উপরে রাজত্ব করিলেন, এমন কথা আছে। সোণারগাঁ নগরের নিকট-

বর্ত্তি বিক্রমপুর তাঁহার বাসস্থান ছিল, তথাপি যে গৌড় নগর তখন দেশের রাজধানীরূপে মান্য ছিল, তথায়ও তিনি কখনো ২ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতিরা অদ্যাবধি যে সকল শ্রেণীতে বিভক্ত আছেন, তাহা বল্লালদ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। যাঁহারা সকলের মধ্যে গুণবান, তাঁহাদিগকে তিনি কুলীন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিয়োগানুসারে ঐ কৌলিন্য পুরুষানুক্রমে পুত্র পৌত্রাদির প্রতি বর্ত্তিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশের দুরবস্থার একটি মূলকারণ হইয়া উঠিয়াছে, যেহেতুক বর্ত্তমান কালের কুলীনেরা আপন ২ পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় গুণের পাত্র না হইয়া কেবল তাহাদের ন্যায় লৌকিক সমাদরের পাত্র হন।

বল্লাল সেনের অধিকার সময়ে বাঙ্গালা রাজ্য নীচে লিখিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল।

১। প্রথম বারেন্দ্র। এই প্রদেশের পশ্চিমসীমা মহানন্দা, দক্ষিণসীমা পদ্মা, পূর্ব্বসীমা করতোয়া নদী, উত্তরসীমা নানা পরদেশ।

২। দ্বিতীয় বঙ্গ। এই প্রদেশ করতোয়া নদীর পূর্ব্বতীর অবধি ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ছিল, এবং ঢাকার নিকটবর্ত্তি বিক্রমপুর নামক তৎকালীয় রাজধানী তাহার মধ্যবর্ত্তী ছিল।

৩। তৃতীয় বগ্‌ড়ীদ্বীপ কিম্বা দ্বীপ। এই প্রদেশ ত্রিকোণাকৃতি, এবং তাহার পশ্চিমসীমা ভাগীরথী, ও পূর্ব্বসীমা পদ্মা, ও দক্ষিণসীমা সাগর।

৪। চতুর্থ রাঢ়। এই প্রদেশের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা ভাগীরথী ও পদ্মা নদী, ও পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা নানা পরদেশ।

৫। পঞ্চম মিথিলা। এই প্রদেশের পূর্ব্বসীমা মহানন্দা নদী ও গৌড়, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা নানা পরদেশ।

প্রায় ১১১৬ শালে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন পিতার পদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি গৌড় নগরকে অতি সুশোভিত করিয়া আপন নামানুসারে তাহার নাম লক্ষ্মণাবতী রাখিলেন। লক্ষ্মণের পরে মধু সেন, এবং মধু সেনের পরে কেশব সেন রাজত্ব করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারি সুষেণের পরে সেই বংশহইতে আর কোন রাজা উৎপন্ন হয় নাই, ইহা হিন্দু লোকেরা কহেন, কিন্তু তাঁহার পরেও ঐ বংশীয় নুজ ও লক্ষ্মণীয় নামা দুই রাজা ছিলেন, ইহা মুসলমান ইতিহাসরচকেরা কহেন। ইহার সত্যমিথ্যা জানা যায় না। ১২০৩ শালে যখন মুসলমান লোকেরা প্রথম বার বাঙ্গালার প্রতি আক্রমণ করিলেন, তখন লক্ষ্মণীয় কিম্বা লক্ষ্মণ নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী ছিল।

২ অধ্যায়।

এই ক্ষণে আমরা নানা দেশের যুদ্ধদ্বারা মুসলমান লোকদের অধীন হওনের কথা কহিব। তাহাদের ধর্ম্মস্থাপক মুহম্মদদ্বারা তাহাদের রাজ্যও স্থাপিত হইয়াছিল, পরে ইং ৬৪০ শালে তাঁহার মৃত্যু হইলে মুসলমান লোকেরা অল্প বৎসরের মধ্যে ইউরপ ও আশিয়া ও আফ্রিকার নানা দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র জয়ী হওয়াতে তাহাদের রাজ্য ভূমণ্ডলের তাবৎ রাজ্যের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিল। ইংরাজি ১০০০ শালের পূর্ব্বে সিন্ধু নদীর পশ্চিমস্থিত তাবৎ দেশ মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল, বিশেষতঃ ঐ নদীর পশ্চিমে ত্রিশ ক্রোশ দূরে স্থিত গজনেন নগর মহামুদ নামা রাজার রাজধানী ছিল। পরে ঐ ১০০০ শালে উক্ত মহামুদ বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্তের

সহিত হিন্দুস্থান আক্রমণ ও লুট করণ পূর্ব্বক অনেক ধনপ্রাপ্ত হইয়া আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই রূপে হিন্দু লোকদিগকে পরাজয় করা আপনার সুসাধ্য কর্ম্ম বুঝিয়া পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ বার তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সহস্র ২ লোককে বধ করিলেন এবং অনেক দেবমন্দির ও প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও দেশ লুট করিলেন, কিন্তু সিন্ধু নদীর তীরস্থ অঞ্চল বিনা অন্য কোন প্রদেশে আপনার কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন না, বরং সিন্ধুর পশ্চিমস্থিত গজ্‌নেন্‌ নগর যাবজ্জীবন তাঁহার রাজধানী থাকিল। তাঁহার উত্তরাধিকারি রাজগণ ক্রমে ২ অল্পপরাক্রম হওয়াতে হিন্দু লোকেরা সাহস পাইয়া মহামুদের অধিকৃত নানা স্থান আপনারা পুনরায় অধিকার করিতে লাগিলেন।

এই রূপে হিন্দুস্থানের প্রথম বার আক্রমণ অবধি প্রায় দুই শত বৎসর গত হইলে পরে গোরীয় মুহম্মদ নামা মুসলমানজাতীয় কোন পরাক্রমি লোক ঐ গজ্‌নেন্‌ রাজ্য নষ্ট করিয়া আপনি সিন্ধু নদীর পশ্চিমে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন, তাহাতে উৎপাটিত গজ্‌নেন্‌ রাজ্যের স্থানে গোর রাজ্য হইয়া উঠিল। উক্ত গোরীয় মুহম্মদ ১১৯১ শাকে প্রবল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হিন্দুস্থান আক্রমণার্থে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তৎকালে আজমের, গুজরাট, দিল্লী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি উত্তরদেশীয় রাজ্যের ভূপতিদের পরস্পর বিবাদ হেতুক মুসলমানদিগকে নিবারণার্থে ঐক্য না হওয়াতে মুহম্মদ তিন বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানের সমস্ত উত্তরাংশ আপনার হস্তগত করিয়া তদ্দেশীয় দীর্ঘকালস্থাপিত পরাক্রমবিশিষ্ট সকল হিন্দু রাজবর্গের শেষ করিলেন। পূর্ব্বে মুসলমানেরা বারবার দেশ আক্রমণ

করিয়াও দিল্লী প্রভৃতির হিন্দু রাজগণকে পদচ্যুত করেন নাই, কিন্তু মহম্মদ দেশ পরাস্ত করিয়া তাহাতে আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে কুতবউদ্দীন নামক সেনাপতিকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া সমুদয় দেশ আয়ত্ত করণার্থে সৈন্য পাঠাইতে আজ্ঞা দিলেন। সেই কুতবউদ্দীন আপন প্রভুর মরণানন্তর স্বাধীন হইয়া হিন্দুস্থানের প্রথম বাদশাহ হইয়া উঠিলেন।

পরে কুতবউদ্দীন নিজ রাজ্য আরও বিস্তারিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া বখ্তিয়ার খিলজী নামক আপন সৈন্যাধ্যক্ষকে বেহার দেশ হস্তগত করিতে পাঠাইলেন। তাহাতে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইলে কুতব বঙ্গদেশে যাত্রা করিয়া তাহাও পরাজয় করিতে তাহাকে আজ্ঞা দিলেন। যে বংশ বহুকালাবধি রাজত্ববিশিষ্ট হইয়াছিল, সেই বৈদ্যবংশীয় লক্ষ্মণ সেন তৎকালে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তিনি মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তাদের নিকটে লক্ষ্মণীর নামে বিখ্যাত হন। তিনি আপন পিতার মৃত্যুর পরে ভূমিষ্ঠ হওয়াতে জন্মকালাবধি রাজত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া আশি বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ মুসলমান লোকদের দ্বারা দেশের আক্রমণ হওন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। তাঁহার রাজধানী প্রায় নবদ্বীপে ছিল, তথাপি তিনি মধ্যে ২ গৌড় নগরেও বাস করিতেন; এবং ন্যায়বিচার ও মাহাত্ম্যদ্বারা রাজ্যের শাসন করাতে সকল লোক তাঁহার অতিশয় সমাদর করিত। তাঁহার পরে হিন্দুজাতীয় কোন ব্যক্তি বাঙ্গালার রাজা হয় নাই। ১২০৩ শালে বখ্তিয়ার বঙ্গদেশ আক্রমণার্থে দেশের সীমাতে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণ উক্ত রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুরুক লোকেরা বঙ্গদেশ পরাস্ত করিবে, শাস্ত্রেতে এমত লিপি আছে, সম্প্রতি

তুরুক লোক উপস্থিত হইল, অতএব মহারাজ কোষ লইয়া সপরিবারে পলায়ন করুন, এই পরামর্শ। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, আমি বৃদ্ধ. নবদ্বীপ ত্যাগ করিব না। তাহাতে ব্রাহ্মণাদি সকল প্রধান লোক বৃদ্ধ রাজার কিছু সাহায্য না করিয়া আপন ২ ধনাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক উড়িষ্যা দেশে পলায়ন করিলেন। বখ্তিয়ারের নিবারণের কোন উপায় প্রস্তুত না হওয়াতে তিনি অনায়াসে সৈন্যের সহিত দেশ দিয়া যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি অন্য সকল সৈন্য কোন বনে রাখিয়া আপনি সত্তেরো জন অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া নগরে প্রবেশ করণ পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তৎকালে রাজা আহার করণার্থে বসিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রু আগতপ্রায়, এমন সম্বাদ পাইয়া অট্টালিকার পশ্চাৎভাগের কোন দ্বারহইতে লম্ফ দিয়া নৌকারোহণ পূর্ব্বক উড়িষ্যাতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কেহ ২ কহে তিনি ঢাকার নিকটবর্ত্তী বিক্রমপুর নামে বঙ্গপ্রদেশের প্রধান নগরে পলায়ন করিলেন। নবদ্বীপ বখ্তিয়ারের হস্তগত হইলে বঙ্গদেশে হিন্দুরাজবংশের কর্ত্তৃত্ব শেষ হইল. তাহাতে ১২০৩ শালাবধি ১৭৫৭ শাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ নবদ্বীপ মুসলমানদের হস্তগত হওনাবধি পলাশির নিকটে যুদ্ধ হওন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ নিবাসি হিন্দু লোক সকল মুসলমানদের অধীন হইয়া রহিলেন, সেই পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসরমধ্যে এক বারও স্বাধীন হওনের চেষ্টা করিলেন না। নবদ্বীপহইতে বখ্তিয়ার গৌড় নগরে গমন করিয়া তাহাও অনায়াসে লইলেন, এবং তথাকার দেবমন্দির সকল ভাঙ্গিয়া তাহার ইষ্টক ও প্রস্তরাদিদ্বারা মুহম্মদীয় ভজনালয় নির্ম্মাণ করাইলেন। এক বৎসরের

মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশ তাঁহার অধীন হইল, কেবল যোশার গাঁ অঞ্চল একেবারে পরাস্ত না হইয়া কতক বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন হইয়া রহিল, এবং সীমান্থিত কোন ২ প্রদেশও সমপূর্ণরূপে বশীভূত হইল না, এমন প্রমাণ আছে। বঙ্গদেশ হস্তগত করিয়া বখ্তিয়ার পর-বৎসরে আসাম দেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়া প্রথমে দশ দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে গমন করিলেন. পরে বাইশ খিলানবিশিষ্ট এক পাষাণময় সেতু দিয়া পার হইলেন। বোধ হয় সেই সেতু বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। পরে বখ্তিয়ার আপন সৈন্য পর্ব্বত-ময় দেশে লইয়া গেলেন, কিন্তু যুদ্ধেতে পরাস্ত হইলেন, তাহাতে তিনি লজ্জিত ও কাতর হইয়া প্রত্যাগমন করিলে বঙ্গদেশ তাঁহার বশীভূত হওনের পরে তিন বৎসরান্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। দিল্লীহইতে অতি দূরদেশে থাকাতে তিনি আপন মনের ইচ্ছানুসারে সকল কর্ম্ম করিয়া আপ-নাকে স্বাধীন রূপে দেখাইয়া আপন নামে খুতবা পড়ি-তেন, এবং যুদ্ধে লব্ধ হিন্দুদের ভূমি সকল খিলজীবংশীয় আপন ভৃত্যদিগকে বিতরণ করিতেন। ইহাতে তাঁহারা কালক্রমে অতি পরাক্রমী হওয়াতে প্রায় যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকেই বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃত্বপদ দিতেন।

বখ্তিয়ারের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভৃত্যগণ আপনাদের মধ্যহইতে এক জনকে মনোনীত করিয়া শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিলে সেই ব্যক্তি আপনাকে স্বয়ং রাজা করিলেন। ইহার সম্বাদ পাইয়া দিল্লীর বাদশাহ সৈন্য পাঠাইয়া দেশ হস্তগত করিয়া আলিমর্দ্দনকে সুবাদার করিলেন। অল্প কাল পরে কুতবুদ্দীন বাদশাহের পরলোক হইলে আ-লিমর্দ্দনও স্বাধীন হইলেন, কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত অহঙ্কার

প্রযুক্ত খিলজীবংশীয় প্রধান লোকেরা তাঁহাকে বধ করাইয়া গ্যাস উদ্দীনকে কর্তৃত্বপদ দিলেন। তিনি আপন রাজধানী গৌড় নগরকে সুন্দর গাঁথনিদ্বারা সুশোভিত করিলেন, এবং আপন প্রজাদের হিতের চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেন, বিশেষতঃ বীরভূমির প্রধান নগরহইতে গৌড়ের পূর্ব্বদিগস্থ দেবকোট পর্য্যন্ত দশ দিনের পথ দীর্ঘ এমন সুগম জাঙ্গাল বন্ধ করাইলেন, যে তাহা দিয়া লোকেরা বর্ষাকালেও নির্ব্বিঘ্নে দেশের এক দিগহইতে অন্য দিগ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে পারিল। তিনি বিচারেতে পক্ষপাত না করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় লোককে সমান জ্ঞান করিতেন। পরন্তু তাঁহার অধিক পরাক্রম হওয়াতে আসাম ও ত্রিহুত ও ত্রিপুরার রাজগণ তাঁহাকে কর দিতেন। তিনি এই রূপে দশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখেতে রাজত্ব করিয়া শেষেতে বাদশাহের বশীভূত হইতে অস্বীকৃত হইলে বাদশাহ সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলে তিনি ১২২৭ শালে রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর দশ বৎসরের মধ্যে তিন জন দেশের শাসনকর্ত্তা হইলে পর ১২৩৭ শালে ওষান খাঁ সুবাদারের পদে নিযুক্ত হইয়া ছয় বৎসরান্তে উড়িষ্যা দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু তথাকার হিন্দু লোকেরা তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজধানী গৌড় পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া সেই স্থানকে এবং বীরভূমির নগরকে অবরুদ্ধ করিলেন। তাহাতে ওষান খাঁ অতি ক্লিষ্ট হইয়া বাদশাহের নিকটে সাহায্য যাচ্ঞা করিলে বাদশাহ তাঁহার উপকারার্থে উপযুক্ত সৈন্যের সহিত তৈমুর খাঁকে পাঠাইলেন। তৈমুর খাঁ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া তাহা অতি

সুখজনক দেখিয়া আপনি অধিকার করিতে স্থির করিলে তাঁহার এবং তথান খাঁর মধ্যে যুদ্ধ হইল। দুই মুসলমান শাসনকর্ত্তা পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে. ইহা দেখিয়া হিন্দু লোকেরা অতিশয় হাস্য করিলেন। শেষে তথান পরাস্ত হইলেও সমস্ত সম্পত্তির সহিত দেশহইতে বহির্গমন করিতে অনুমতি পাইয়া অল্পকাল পরে অযোধ্যার সুবাদার হইলেন, এবং তৈমুর দুই বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিলেন।

১২৫৩ শালে মুগিক যজবেক বঙ্গদেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি উড়িষ্যার রাজাকে প্রতিফল দিতে মনস্থ করিয়া তাঁহাকে দুই বার যুদ্ধেতে পরাস্ত করিলেন, তৃতীয় বার যুদ্ধ হইলে তিনি আপনি পরাস্ত হইয়া সকল হস্তি হারাইয়া গৌড় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে শ্রীহট্ট দেশ আক্রমণ করিয়া লুট করণ পূর্ব্বক অধিক ধন প্রাপ্ত হইলেন। পরে দিল্লীর বাদশাহ অতি দুর্ব্বল হইলেন, এমন সমাচার পাইয়া আপনাকে স্বাধীন করিলেন। অল্প কাল গতে তিনি আসাম দেশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু যুদ্ধেতে পরাস্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া মরিলেন. তাহাতে আসাম দেশ আক্রমণকারি মুসলমান লোকেরা দ্বিতীয় বার লজ্জা পূর্ব্বক তথাহইতে পরাঙ্মুখ হইল। মুগিকের মরণানন্তর জেলাল নামক এক ব্যক্তি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া দিল্লীহইতে প্রেরিত হইলেন। তিনি যে সময়ে হিন্দুবংশীয় কতিপয় স্বাধীন রাজাকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, এমন সময়ে করল শাসনকর্ত্তা গৌড় নগর আক্রমণ করিয়া লুট করিলেন, পরে জেলাল যুদ্ধেতে হত হইলেন, এবং তাঁহার বিপক্ষ দিল্লীতে প্রেরিত উপঢৌকনের গুণে বঙ্গদেশের সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

১২৭৭ শালে অজীর তোগরেল এ দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া ত্রিপুরা দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক তথাহইতে অনেক ধন ও এক শত হস্তি হরণ করিয়া লইলেন। পরে দিল্লীর মহারাজ বালিন মরিয়াছেন, এমত জনরব হইলে তিনি পরাধীন থাকিতে অস্বীকার করিয়া আপনি বঙ্গদেশের রাজা হইলেন। কিন্তু ঐ প্রকার জনরব হইলেও বাদশাহ তৎকালে মরেন নাই, কেবল জরাগ্রস্ত ছিলেন। অতএব তিনি রাজদ্রোহি দেশাধ্যক্ষকে দমন করণার্থে দুই বার সৈন্যসমূহ পাঠাইলেন, এবং উভয়ের পরাজয় হইলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়াতে আপন সমস্ত সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া আপনি সুবাদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহাতে তোগরেল আপন সমস্ত ধন ও সৈন্য লইয়া উড়িষ্যা দেশে পলাইলে বাদশাহও তাঁহার পশ্চাতে গমন করিয়া কতক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তি স্থানে তাম্বু স্থাপন করিলেন। তৎকালে বাদশাহের নিকটে মুহম্মদশাহ নামে অতিশয় সাহসিক এক জন সেনাপতি ছিলেন, তিনি এক দিন চল্লিশ জন সঙ্গিদের সহিত অশ্বারোহণে শত্রুর ছাউনীতে প্রবেশ করিয়া সোজা পথে তোগরেলের নিজের তাম্বুতে গিয়া "মহারাজ বালিনের জয়" এমত উচ্চৈঃস্বর পূর্ব্বক যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল তাহাকেই খড়্গাঘাতে বধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজদ্রোহি সুবাদার একাকী কোন নদীর তীরে পলাইলে মুহম্মদ তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া জলমধ্যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনার সমাচার শুনিবামাত্র তাঁহার সকল সৈন্য পলাইয়া গেল। তাহাতে বাদশাহ অনেক দ্রব্য লুট করিয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে ১২৮২ শালে তিনি আপন পুত্র নাসির

উদ্দীনকে বঙ্গদেশের অধ্যক্ষপদ দিলেন। চারি বৎসর গত হইলে সেই নাশিরের পুত্র কয় কোবাদ দিল্লীর বাদশাহ হইলেন. কিন্তু তিনি কেবল সুখের চেষ্টাতে রত হইলে তাঁহার পিতা পত্রদ্বারা তাঁহাকে সুখের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া রাজকর্ম্মে মন দিতে নিবেদন করিলেন, পরে সেই নিবেদন নিষ্ফল দেখিয়া সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং কয় কোবাদও সসৈন্য হইয়া পিতার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। দুই সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখাসম্মুখী হইলে পিতা পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে কয় কোবাদ সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু আপন দুষ্ট মন্ত্রির পরামর্শানুসারে পিতাকে সিংহাসনের নিকটে আগমন সময়ে তিন বার দণ্ডবৎ হইতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ পিতা পুত্রের সাক্ষাতে আসিয়া তিন বার ভূমিষ্ঠ হইলে পুত্র তাহা সহ্য করিতে অপারক হইয়া সিংহাসনহইতে লম্ফ দিয়া পিতার গলে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই রূপে মিলন হইলে নাশির উদ্দীন অনেক দিবস পুত্রের নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার সুপরামর্শ দিলেন। কিন্তু পুত্র দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় সুখচেষ্টাতে মগ্ন হইলে ঐ সকল সুপরামর্শ বৃথা হইল. পরে তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে বধ করিলেন। এমন অস্থির অবস্থার সময়ে নাশির উদ্দীন স্বাধীন হইয়া বঙ্গদেশের শাসন করেন।

পরে ১২১৭ শাকে এক নূতন রাজবংশ দিল্লীর রাজত্ব প্রাপ্ত হইল, অলাউদ্দীন নামক মহাবীর বাদশাহ হইলেন, এবং তিনি দক্ষিণ দেশও আপনার বশীভূত করিতে স্থির করিলেন। নাশির নম্রতাপূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন, এবং তিনি রাজ্যা

ইহা জ্ঞাত হইয়া ভয়েতে আপন অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিলেন। তথাপি আলা উদ্দীন বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে নাজির গৌড় ও তন্নিকটস্থ দেশের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু দেশের পূর্ব্বদক্ষিণ অংশের অধ্যক্ষপদ বাহাদুর খাঁকে দত্ত হইল, এবং তিনি সোণার গাঁ নামক পূর্ব্বকালীয় রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন। অল্প বৎসর পরে বাহাদুর অতিশয় দৌরাত্ম্য করিলে এবং বাদশাহের অধীনতা অস্বীকার করিলে মুহম্মদ তোগলক নামক নূতন বাদশাহ দিল্লীহইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বৃদ্ধ নাজির উদ্দীন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপঢৌকন আনিলে বাদশাহ তাঁহাকে গৌড়ের অধ্যক্ষপদে স্থির করিলেন। এই রূপে তেতাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশের শাসন করিলে ১৩২৫ শালে তাঁহার মৃত্যু হইল। বাহাদুর বাদশাহের জয় নিবারণ করিতে অপারক হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলে বাদশাহ তাঁহার সকল ধন হরণ করিয়া অন্য কোন দণ্ড না দিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। সেই সময়াবধি বঙ্গদেশ আর পোনেরো বৎসর পর্য্যন্ত দুই দেশাধ্যক্ষদ্বারা শাসিত হইল। পরে মুহম্মদ তোগলক বাদশাহ আপন প্রজাদের ঘৃণাস্পদ হইলে সোণার গাঁ নিবাসি দেশাধ্যক্ষের অস্ত্রবাহক ফক্কীর উদ্দীন দানাদিদ্বারা সৈন্য সকলকে স্বপক্ষ করিয়া দেশের কর্ত্তা হইলেন। সোণার গাঁ তাঁহার বাসস্থান ছিল, এবং তিনি আপন নামে মুদ্রা টঙ্কিত করিতেন ও খুৎবা পড়িতেন, এবং বাদশাহ দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তাঁহাকে দমন করিতে পারিলেন না। এই রূপে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কর্তৃত্ব করিলে পর তিনি লোভেতে সমস্ত দেশের অধিকার পাইতে ইচ্ছুক হইয়া গৌড়দেশ

আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ধরা পড়িয়া হত হইলেন। ফকীর উদ্দীনের উত্তরাধিকারী মুবারিক আলি সতেরো মাসের পরে শমস উদ্দীনকর্ত্তৃক হত হইলেন। সেই শমস উদ্দীন সমস্ত দেশের অধিকার পাইয়া মুসলমান জাতীয়দিগের মধ্যে প্রথমে প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইয়া বঙ্গদেশের রাজত্ব করিলেন। এই রূপে বঙ্গদেশ ১২০৩ শালে মুসলমানদের বশীভূত হইয়া তদবধি একশত চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লী রাজ্যের অধীন হইল। পরে ১৩৪৩ শালে তাঁহার রাজবংশ স্বাধীন হইলে তদবধি দুইশত তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৫৭৬ শাল পর্য্যন্ত মুসলমান জাতীয় স্বাধীন রাজাদের দ্বারা শাসিত হইল। ১৫৭৬ শালে মোগল জাতীয় আক্বর নামক দিল্লীর বাদশাহ তাহা বশীভূত করিলে তাহা সেই রাজ্যের এক সুবা অর্থাৎ প্রদেশ হইল।

৩ অধ্যায়।

শমস উদ্দীন আপন রাজ্য দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ ত্রিপুরার রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার অনেক ধন ও হস্তি হরণ করিলেন। কারণ বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমাতে শ্রীহট্ট অবধি ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যে বন বিস্তারিত হয়, সেই বনহইতে পূর্ব্বাবধি সমস্ত দেশের প্রয়োজনীয় হস্তি সকল আনীত হইয়া আসিতেছে। পরে শমস উদ্দীন সোণার গাঁ ত্যাগ করিয়া গৌড়ের নিকটবর্ত্তি পেরুয়া নামক স্থানে রাজধানী করিলেন। এইরূপে দশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশের শাসন করিয়া তিনি বাদশাহের নিযুক্ত বেহারের সেনাধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ফিরোজ নামক দিল্লীর বাদশাহ তাঁহার দণ্ড দিয়া বঙ্গদেশ বশীভূত করণার্থে সসৈন্যে উপস্থিত হইলে শমস

উদ্দীন পেণ্ডুয়ার রক্ষার্থে আপন পুত্রকে রাখিয়া আপনি সোণার গাঁ পর্য্যন্ত ফিরিয়া গেলেন। পরে বাদশাহ পেণ্ডুয়াকে অনায়াসে লইয়া প্রায় সোণার গাঁ পর্য্যন্ত যাত্রা করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তি যে আকদালা নামক দুর্গে বঙ্গরাজা আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই দুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু বর্ষাকালের আরম্ভ পর্য্যন্ত তাহা লইতে অপারক হইয়া সন্ধি করণ পূর্ব্বক দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে ১৩৫৭ শালে বঙ্গরাজা দিল্লীতে উপঢৌকন পাঠাইলে বাদশাহ আপনাকে বঙ্গদেশ বশীভূত করণে অসমর্থ বুঝিয়া সেই রাজ্যের স্বতন্ত্রতাতে সম্মত হইয়া তাহার সীমা নিশ্চয় করিয়া দিলেন। তাহাতে শামস উদ্দীন নির্ভয়ে দেশের শাসন করিলেন, এবং পাণ্ডুয়ার অত্যুপান্তে স্থিত যে স্থানের খ্যাতি এখন বার্ষিক মেলাপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে, সেই হাজিপুর নগর নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে ষোলো বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শাসন করিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুত্র সিকন্দর ১৩৫৮ শালে রাজত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

শামস উদ্দীনের মৃত্যুর সমাচার বাদশাহের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। তাহাতে সিকন্দর আপন মৃত পিতার ন্যায় আকদালা দুর্গেতে আশ্রয় লইলে বাদশাহের সৈন্যগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা বৃথা অবরোধ করিয়া বর্ষাকাল হইলে নিষ্ফল চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইল, এবং বাদশাহ উপঢৌকনরূপে কতক হস্তি লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পরে ১৩৬১ শালে সিকন্দর রাজা পেণ্ডুয়ার নিকটে আদিনা নামক এক বৃহৎ মুহম্মদীয় ভজনালয় নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার যে কাৎড়াদি চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারা ঐ ভজনালয় যে অতি সুন্দর

ছিল, এমত অনুমান হয়। তাঁহার দুই পত্নী ছিল, একা- হইতে সতেরো পুত্র, দ্বিতীয়াহইতে এক পুত্রমাত্র জন্মে, এবং এই দ্বিতীয়ার পুত্রকে নষ্ট করণার্থে তাহার বিমাতা সর্ব্বদা চেষ্টা করে। ইহা বুঝিয়া সেই সহোদররহিত যুবা পিতার গৃহহইতে পলাইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সসৈন্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে গমন করিয়া সংগ্রামে হত হইলেন। এইরূপে গ্যাস উদ্দীন নামক ঐ যুবা রাজত্ব পাইয়া তৎক্ষণাৎ আপন বৈমাত্র ভ্রাতার চক্ষু উৎপাটন করাইলেন, পরে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ন্যায্যরূপে দেশের শাসন করিলেন। তিনি হাফিজ নামক অতি সুখ্যাত পারসীয় কবিকে আপন সভাতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু হাফিজ এত দূরদেশে আসিতে সম্মত হইলেন না। ১৩৭৩ শালে গ্যাস উদ্দীনের মৃত্যু হয়, তাহাতে কালক্রমে তাঁহার পুত্র ও পৌত্র রাজত্বপ্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার পৌত্র বিটোরিয়ার শাসনকর্ত্তা গণেশ নামক এক হিন্দুলোককর্তৃক পদচ্যুত হইলেন। তাহাতে আমাদের হিন্দু জাতীয় এক ব্যক্তি রাজত্ব পাইলেন, তিনি অবশ্য আমাদের সপক্ষ হইয়া আমাদের ধর্ম্মের উপকার করিবেন, গণেশের হিন্দু প্রজারা এমন আশা করিলেন। কিন্তু তিনি মুসলমান লোকদিগকে অতি প্রবল দেখিয়া তজ্জাতীয় পাঠান জমীদার লোকদের অধিকৃত ভূমি সকল পূর্ব্বমত ভোগ করিতে দিলেন, এবং পেরুয়া নগরে অনেক মন্দির নির্ম্মাণদ্বারাতেই হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আপন অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে পরে উভয় জাতীয় প্রজারা তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার মৃত শরীরের সমাদর করিতে প্রয়াস করিলেন, অর্থাৎ মুসলমানেরা তাহার কবর দিতে এবং

হিন্দুরা তাহা বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। পরে তাঁহার পুত্র চৈতমল রাজত্ব পাইয়া হিন্দু ধর্ম্ম অস্বীকার করিলেন। তিনি পেণ্ডুয়া নগর ত্যাগ করণ পূর্ব্বক গৌড় নগরে বাস করিয়া সেই স্থানকে সুন্দর২ অট্টালিকাদ্বারা সুশোভিত করিতে পূর্ব্বকালীয় রাজগণ হইতে অধিক চেষ্টান্বিত ছিলেন, বিশেষতঃ তত্রকার অতি সুদৃশ্য মুহম্মদীয় ভজনালয় ও স্নানকুণ্ড ও চৌবাচ্চা ও জলালী নামক সরাই তাঁহার আজ্ঞানুসারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ন্যায্য-রূপে দেশের শাসন করিয়া ১৪০৯ শালে পরলোকপ্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র আহমদ শাহ তাঁহার পদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তৈমুরলঙ্গ অসংখ্য মোগল সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া দিল্লী আক্রমণ পূর্ব্বক তথাকার সহস্র২ লোককে বধ করিয়া বাদশাহ হইয়াছিলেন। পরে এক বৎসরমাত্র ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া তিনি স্বদেশে গমন করিলেন, পুনরায় আইলেন না। তৈমুরের আক্রমণ দ্বারা দিল্লী রাজ্যের বিপর্য্যয় হওয়াতে প্রদেশাধ্যক্ষ সকল স্বাধীন হইলেন, তাহাতে মালবা ও গুজ্জরাট ও খণ্ডেশ ও জোয়ানপুর, এই চারি প্রদেশ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র২ রাজ্য হইয়া উঠিল। এই চারি নূতন রাজ্যের মধ্যে যে জোয়ান-পুর রাজ্য বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহার ইব্রাহীম রাজা বঙ্গদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক তথাকার অনেক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন. বঙ্গদেশের রাজা আহমদ শাহ তাহার নিবারণে অসমর্থ হইয়া তৈমুরের পৌত্র শাহ রোচ নামক দিল্লীর রাজার নিকটে পত্রদ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে শাহ রোচ অবিলম্বে ইব্রাহীমকে এই-রূপ পত্র লিখিলেন, তুমি যদি [illegible] জাতিতে [illegible]

না হও, তবে আমি আসিয়া শরীর হইতে তোমার প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করিব। তদনন্তর ইব্রাহীম যে আরবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন, ইহার উদ্দেশও দৃষ্ট হয় না। ১৪২৬ শালে আহমদ নিঃসন্তান হইয়া মরিলেন, তাহাতে এই অল্পকালস্থায়ি হিন্দু রাজবংশের শেষ হইল। যাহার উন্নতি দৈবঘটনার ফল ছিল, এবং যাহাদ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং সেই বংশজাত দ্বিতীয় রাজা আপনি মুসলমান হইয়া আপন হিন্দু প্রজাদের অনেককেও সেই মতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

অপর ১৪২৬ শালে নাজির শাহ মুসলমান জাতীয় প্রধান লোকদের দ্বারা রাজাভিষিক্ত হইয়া একত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন, এবং গৌড় নগরকে সুন্দর প্রবেশস্থানদ্বারা সুশোভিত ও চতুর্দ্দিগে নির্ম্মিত গড়দ্বারা শত্রুদের দুর্গম করিলেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কর্ম্মের প্রমাণ নাই। পরে তাঁহার পুত্র বারবেক শাহ রাজত্বপদ পাইয়া সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত দেশের শাসন করিলেন; এবং যে হাপসী ও কাফরী ভৃত্য সকল কালক্রমে রাজ্যের বিস্তর অপকার করিল, তাহারা প্রথমে এই রাজাদ্বারা রাজসভাতে আনীত হইয়াছিল। বারবেক শাহের পুত্র সাত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিলে রাজ্যের প্রধান লোকেরা ফতে শাহকে রাজত্বপদে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তিনি অহঙ্কৃত ও পরাক্রান্ত ঐ হাপশী লোকদিগকে দমন করিতে উপক্রম করাতে তাহাদের কর্ত্তৃক হত হইলেন। পরে তাঁহার প্রধান খোজা রাজা হইয়া সুলতান শাহজাদা এই নাম পাইলেন, কিন্তু অতি অল্প কাল গতে মুলুক আন্দিয়েল নামে তাঁহার প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে বধ করিয়া বঙ্গদেশের

রাজা হইলেন। তিনি হাপসী লোক ছিলেন, কিন্তু অতি বুদ্ধিমান, এবং তিনি নূতন গাঁথনিদ্বারা গৌড় নগরের বৃদ্ধি করিলেন। তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারি পুত্র উভয়ে সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দি বৎসরমাত্র রাজত্ব করিলেন। পরে মজুফর শাহ নামক যে ব্যক্তি রাজা হইলেন, তিনি দুরন্ত স্বভাব প্রযুক্ত প্রজাদের ঘৃণাস্পদ হওয়াতে তাঁহার উজীর হুসিন শাহ শরিফ রাজদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে অবরুদ্ধ করিলেন, পরে নগরহইতে বহির্গত রাজার সহিত যুদ্ধ হইলে গৌড়ের নিকটস্থ সেই রণস্থলে অন্যান্য বিংশতি সহস্র লোকদের সহিত রাজাও হত হইলেন।

উক্ত সৈয়দ হুসিন শাহ ১৪৮৯ শালে বঙ্গদেশের রাজত্ব পাইয়া সেই দেশের রাজশ্রেণীর মধ্যে পরাক্রমেতে প্রধান হইয়া উঠিলেন। মক্কা নগর তাঁহার জন্মভূমি ছিল, এবং তিনি মুহম্মদেরই বংশোদ্ভব ছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁহার আগমনসময়ে তাঁহার অতিক্ষুদ্র পদ ছিল, পরে চাঁদপুরের কাজী তাঁহার কুল জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলে তিনি ক্রমে২ প্রধান মন্ত্রী হইয়া অবশেষে রাজা হইলেন। তাঁহার প্রভু মজুফর শাহ যে যুদ্ধেতে হত হইয়াছিলেন, সেই যুদ্ধের শেষ হইলে সৈয়দ হুসিনের সৈন্যগণ তাঁহার অনুমতিক্রমে গৌড়নগর কএক দিন পর্য্যন্ত লুট করিল, কিন্তু শেষে নিবৃত্ত হইতে অস্বীকার করিলে তিনি তাহাদের মধ্যে বারো সহস্র জনের প্রাণদণ্ড করিলেন। এইরূপে রাজত্ব পাইয়া তিনি রাজশাসনের নিয়ম সুধরাইতে স্থির করিলেন। অতএব পাইক নামে যে প্রহরিগণ পূর্ব্বে বার২ রাজাদিগকে পদচ্যুত করিয়াছিল, প্রথমে তাহাদিগকে, পরে তাবৎ হাপসী লোককে বিদায় করিয়া উত্তরহিন্দুস্থানহইতে তাড়িয়া দিলেন। তাহাতে

তাহারা দক্ষিণে গমন করিয়া তথায় সিদ্দী নামে খ্যাত্যাপন্ন হইল।

এইরূপে রাজ্যশাসনের নিয়ম স্থির করিয়া তিনি চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত অতি ন্যায্যরূপে রাজত্ব করিলেন। জ্ঞানি লোকদের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। এবং আসাম দেশের যে অঞ্চল বাঙ্গালার নিকটস্থ আছে, তাহা এবং উড়িষ্যা দেশ তিনি আক্রমণ করিলেন। আর তাঁহার অধিকারসময়ে জোয়ানপুরের হুসৈন রাজা আপন রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া বঙ্গদেশে আশ্রয় লইলে হুসিন তাঁহাকে রাজার উপযুক্ত বৃত্তি দিলেন। পরে দিল্লীর বাদশাহ হুসৈনকে ধরিবার চেষ্টাতে বঙ্গদেশের সীমার আগমন করিলে হুসিন তাঁহার সহিত সন্ধি স্থির করিয়া বেহার ও ত্রিহুত ও সারণ এই তিন প্রদেশ বাদশাহের হইবে, কিন্তু বাদশাহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবেন না, এই নিয়ম করিলেন। ঐ হুসৈন রাজার পরে জোয়ানপুরের স্বাধীন রাজা আর কেহ হয় নাই। পরে ১৫২০ সালে হুসিন পরলোকপ্রাপ্ত হইলে তাহার পুত্র নসরিত শাহ রাজা হইলেন। তাহার অধিকারসময়ে সুলতান বাবের কাবুল হইতে আগমন করিয়া দিল্লী নগর হস্তগত করিয়া ১৫২৬ সালে ভারতবর্ষে মোগল রাজ্য স্থাপন করিলেন। এবং নসরিত বেহার দেশ জয় করিয়া দিল্লীর মহামূদ লোদী নামক পদচ্যুত বাদশাহের সাহায্য করাতে বাবের তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তাহাতে নসরিত বিবেচনা করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন; অবশেষে রাজধানীর নপুংসক ভৃত্যেরা তাঁহার নিষ্ঠুরতাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বধ করিল। সোণার মসজিদ নামক যে বৃহৎ ভজনালয় গৌড় নগরের একটি প্রধান ভূষণস্বরূপ ছিল,

তাহা ঐ নসরিতকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে তাঁহার পুত্র মুহম্মদ শাহ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি অতি প্রসিদ্ধ শের শাহদ্বারা পরাজিত হইয়া পদচ্যুত হইলেন।

শের শাহের পূর্ব্বে যত মুসলমান লোক বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিল, সেই সকলের অপেক্ষা তিনি মহান ছিলেন। প্রথমে তাঁহার নাম ফরিদ ছিল, পরে এক সিংহের সহিত একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিলে, তিনি শের অর্থাৎ সিংহ এই নাম পাইলেন। তিনি আপগান (অর্থাৎ পাঠান) জাতীয় ছিলেন; এবং তাঁহার পিতামহ কর্ম্মের চেষ্টাতে হিন্দুস্থানে আসিয়া দিল্লীর বাদশাহ বেলোলী লোদীদ্বারা কোন কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার পিতা বেহার দেশের সাসরাম জেলার শাসনকর্ত্তৃত্বপদ পাইলেন। পিতার মৃত্যুর পরে শের শাহ পৈতৃক ভূমি পাইয়াও আপন জ্ঞাতি কুটুম্বের দ্বেষ প্রযুক্ত দুই বার তাহা হারাইয়াছিলেন। এমত সময়ে প্রতাপান্বিত বাবোর দিল্লীর বাদশাহ হইলে শের তাঁহার সভাতে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণের অনুমতি পাইলেন। সেই সুযোগের সময়ে তিনি মোগল লোকদের স্বভাব ও শক্তি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষহইতে তাড়িয়া দিতে সহজ ও আপনার সাধ্য কর্ম্ম বুঝিলেন। পরে শের শাহ রাজসভা ত্যাগ করিয়া বেহার দেশে গমন করিয়া আপন বুদ্ধি ও ছলদ্বারা সেই দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তৎকালে পদচ্যুত বাদশাহ সিকন্দর লোদির পুত্র মহামুদ বেহারে উপস্থিত হইয়া তথাকার প্রধান লোকদের দ্বারা সেই দেশের রাজপদে নিযুক্ত হইলে শের তাঁহার নিবারণে অসমর্থ প্রযুক্ত তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার

শেরকে বাবোরের পুত্র হুমায়ুন নামক দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শের মোগল লোকদের পক্ষীয় হইলেন, তাহাতে তাহারা জয়ী হইল। অল্পকাল পরে হুমায়ুনকে গুজরাটে যাইতে হইলে শের শাহ বেহার দেশ জয় করিয়া বঙ্গদেশও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে তথাকার রাজা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া ১৫৩৭ শালে গোয়া দেশে পর্ত্তুগীস লোকদের নিকটে পত্র পাঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা কখনো অস্ত্র হস্তে করিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তৎকালে পর্ত্তুগীস লোকদের প্রধান অধ্যক্ষ বঙ্গদেশের রাজার সাহায্যার্থে নয়খান যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করিলেন। ঐ জাহাজ সকল যখন উপস্থিত হইল, তখন উপকার করণের সময় অতীত ছিল। যেহেতুক শেরের আগমনে বঙ্গদেশের মুসলমান রাজা প্রথমে গৌড় নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, পরে খাদ্য দ্রব্যের অকুলান হইলে নৌকাযোগে গাজীপুরে পলাইয়া তথাহইতে চুনারে প্রস্থান করিলেন, যেহেতুক হুমায়ুন সসৈন্যে চুনারে ছিলেন। ইতিমধ্যে গৌড় নগরনিবাসিরা শেরকে গ্রাহ্য করিয়াছিল, কিন্তু হুমায়ুন ক্রমে২ নিকটবর্ত্তী হওয়াতে শের সাসরামে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তিনি কোন ছলেতে রতাস নামক দুর্গ লইয়াছিলেন। সেই দুর্গ শোণ নদের তীরস্থ এক পর্ব্বতের চূড়াতে নির্ম্মিত এবং হিন্দুস্থানের সমস্ত দুর্গের মধ্যে অতি দুর্গম্য ছিল। শের এই রতাস নামক গড়ের দৃঢ় আশ্রয়ে আশ্রিত ছিল, ইতিমধ্যে হুমায়ুন তিন মাস পর্য্যন্ত গৌড় নগরে সুখভোগে কাল যাপন করিয়া বর্ষাকাল হওনে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন।

তাহাতে যে পথ দিয়া বাদশাহকে গমন করিতে হইল, সে পথের এক স্থানে অর্থাৎ কর্ম্মনাশা নদীর তীরে শের শাহ আপন সৈন্য স্থাপন করিয়া তাঁহার অগ্রগমন রোধ করিলেন; অতএব বাদশাহের সৈন্য সকল অগ্রসর হইতে কিম্বা পশ্চাতে গমন করিতে না পারাতে তিন মাস পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া স্ব২ তাম্বুতে রহিল। অবশেষে যদি তুমি পথ ছাড়িয়া দেও, তবে আমি তোমাকে বঙ্গ ও বেহার দেশ দিব, হুমায়ুন শেরের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইলে শের শাহ তাহাতে সম্মত হইয়া কোরাণ স্পর্শ করিয়া এই শপথ করিলেন, আমি মোগলদিগের অপকার করিব না। কিন্তু সেই দিনের রাত্রিতে যে সময়ে তাহারা ছাউনীতে ভোজনপানাদি সুখভোগে মগ্ন ছিল, সেই সময়ে শের শাহ নদী পার হইয়া তাহাদের আট সহস্র লোককে বধ করিলেন, কিন্তু বাদশাহ কএক জন বন্ধুর সহিত পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। ১৫৩৯ শালে এই ঘটনা হইয়াছিল। পরে শের শাহ অবিলম্বে প্রস্থান করিয়া গৌড় নগরে পঁহুছিয়া পরদিনে বঙ্গ ও বেহার দেশের রাজা হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সম্বৎসরের শেষে রাজ্যশাসনের নিয়ম স্থির হইলে তিনি পঞ্চাশ সহস্র পাঠান সৈন্য লইয়া বাদশাহের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তাহাতে কান্যকুব্জের নিকটে সংগ্রাম হইলে হুমায়ুন পরাস্ত হইলেন, এবং শের দিল্লীর বাদশাহ হইয়া শের শাহ এই নাম পাইলেন।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইবামাত্র শের শাহ বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহা নানা জেলাতে অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করিয়া রাজ্য এমত সুস্থির করিলেন যে তাঁহার অধিকারসময়ে তাহা আর অস্থির হইল না। ১৫৪১ শালে তিনি আগ-

গ্রাতে গমন করিয়া বাদশাহের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু ১৫৪৫ শালে এক গোলা ফাটিয়া পড়াতে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাহাতে যে রাজত্বপদের চেষ্টাতে তিনি পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল পাঁচ বৎসরমাত্র ভোগ করিলেন। তথাপি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অনেক চিহ্ন থাকিল, ফলতঃ বঙ্গদেশস্থ সোণার গাঁ নামক নগর অবধি সিন্ধু নদীর তীর পর্য্যন্ত যে পথ সহস্র ক্রোশ দীর্ঘ আছে, সেই পথের মধ্যে তিনি সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে প্রত্যেক উত্তরণীয় স্থানে এক ২ সরাই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং এক ২ ক্রোশ অন্তরে এক ২ কূপ খনন করাইয়াছিলেন, এবং পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করাইয়াছিলেন, এবং প্রতি সরাইতে সকল পথিকদের সেবা তাঁহার ব্যয়ে হইবে, এমত আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এবং ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি প্রথমে বাহনারূঢ় ডাক করিয়াছিলেন। আর তাঁহার অধিকারসময়ে ডাকাইতির উল্লেখও হইত না। সাসরাম নামক স্থানের নিকটবর্ত্তি অর্দ্ধক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধক্রোশ প্রশস্ত এক জলাশয়ের মধ্যে তাঁহার যে কবরস্থান আছে, তাহা ভারতবর্ষের সকল গাঁথনির মধ্যে অতি সুন্দর ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালের শাসনকর্ত্তাদের অমনোযোগ প্রযুক্ত ক্রমে ২ নষ্ট হইতেছে।

শের শাহের মৃত্যু অবধি মোগললোকদের অধিকার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৫৪৫ শাল অবধি ১৫৭৬ শাল পর্য্যন্ত, এই একত্রিংশ বৎসরে ক্রমে চারি জন সুবা বঙ্গদেশের শাসন করিলেন। শেরের পুত্র সেলিমসাহা মুহম্মদ খাঁ সূর নামক তাঁহার এক কুটুম্ব বঙ্গদেশের শাসন করিতে নিযুক্ত হইয়া আপন প্রভুর মৃত্যু না হওন পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত-

রূপে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন; পরে স্বাধীন হইয়া জোয়ানপুর প্রদেশের কোন২ অঞ্চল বশীভূত করিলেন, কিন্তু অবশেষে বাদশাহের সৈন্যগণ ১৫৫৪ শালে তাঁহাকে পরাস্ত করিল। বাহাদুর শাহ্ নামক তাঁহার পুত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া এক বৎসরান্তে দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তাহাতে মুঙ্গেরের নিকটে সংগ্রাম হইলে বাদশাহ পরাস্ত হইয়া হত হইলে বাহাদুর শাহ্ বঙ্গ ও গৌড়ের দেশের রাজত্বপদে স্থির হইয়া মরণদিন পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে দেশের শাসন করিলেন। ১৫৬০ শালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার যে ভ্রাতা তাঁহার পদপ্রাপ্ত হইলেন, তিনিও তিন বৎসরান্তে গৌড় নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার পুত্র রাজা হইবামাত্র হত হইলেন। পরে ১৫৬৪ শালে কার্রানী বংশীয় সলিমান নামক এক জন প্রসিদ্ধ পাঠান বলদ্বারা রাজত্ব পাইয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকটে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া সমাদরপূর্ব্বক প্রণয় জানাইলেন। এইরূপ পরিণামদর্শিতার কৌশলে সলিমান বঙ্গদেশের শাসনপদে স্থির হইয়া পরদেশের পরাজয় করিতে পারক হইলেন।

ইহার পূর্ব্বে উড়িষ্যার রাজগণ পরাক্রমী হইয়া বঙ্গদেশের কোন২ অঞ্চল আপনাদের বশীভূত করিয়াছিলেন, এই জন্যে ভাগীরথীতীরস্থ ত্রিবেণী পূর্ব্বে আমাদের রাজ্যের সীমা ছিল, উড়িয়া লোকেরা অদ্যাপি এমন দর্প করিয়া থাকে। ১৫৫০ শালে তৈলঙ্গী মুকুন্দদেব নামক যে ব্যক্তি উড়িষ্যা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, তাঁহার পরে সেই দেশ আর স্বাধীন রাজাদের কর্তৃক শাসিত হয় নাই। তিনি অতি সাহসিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং রাজত্ব পাইয়া কএক বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণের

উপকারার্থে ও ধর্ম্মসেবনার্থে নানা কর্ম্ম করিতে ২ কাল-যাপন করিতেন; বিশেষতঃ যে ত্রিবেণী নামক তীর্থস্থান তাঁহার রাজ্যের উত্তরসীমা ছিল, তথায় এক মন্দির ও এক ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের সলিমান রাজা উড়িষ্যা দেশ আপনার বশীভূত করিতে স্থির করিয়া আপন সৈন্যগণকে মুকুন্দের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন; এবং তাঁহার সেই চেষ্টা প্রথমে নিষ্ফল হইলে তিনি কালাপাহাড় নামক আপন সেনা-পতিকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। উক্ত কালাপাহাড এমন ভয়ানক, যে তাঁহার জয়ঢক্কার ধ্বনিতে অনেক ক্রোশ দূরে স্থিত দেবপ্রতিমা সকলের হস্তপদাদি খসিয়া ভূমিতে পড়ে, এতদ্দেশীয় লোকেরা এমত কহিতেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব ছিলেন, কিন্তু গৌড় নগরের কোন যবনরাজকুমারী তাঁহার প্রতি আসক্তা হইলে তিনি মুসলমানদের মত অবলম্বন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তদবধি হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষ হইয়া অন্য যত বিপক্ষের বর্ণনা ইতিহাসগ্রন্থে লিখিত আছে, সকলের অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুররূপে তাহার ক্ষতি করি-লেন। সলিমান রাজার আজ্ঞানুসারে উড়িষ্যা দেশ আ-ক্রমণ করিয়া তিনি সেই দেশের রাজাকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা রাজ্যের স্বাধীনতা একেবারে নষ্ট করিলেন। মুসলমানদের প্রমাণে বোধ হয় ইহা ১৫৬৮ শালে ঘটিয়া-ছিল, কিন্তু উড়িয়া ইতিহাসলেখকেরা বলে ১৫৫৮ শালে হইয়াছিল। কালাপাহাড় উড়িষ্যা দেশে হিন্দু ধর্ম্মের একটি চিহ্নও রক্ষা করিতে অসম্মত হইয়া অতি দুরন্ত-রূপে ব্রাহ্মণদিগকে তাড়াইয়া দিলেন, ও দেবমন্দির সকল ভূমিসাৎ করিলেন, ও বিগ্রহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

বিশেষতঃ জগন্নাথের প্রতিমার বিরুদ্ধে আপন ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিদেশীয় শত্রুকর্তৃক উড়িষ্যা দেশের দুইবার আক্রমণ হইলে পুরোহিতেরা ঐ দেবপ্রতিমাকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল, অতএব যে সময়ে কালাপাহাড় মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখনও তাঁহারা জগন্নাথদেবকে এক গাড়িমধ্যে আচ্ছাদনপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া পলাইয়া চিল্কা নামক হ্রদের তীরে কোন গর্ত্তমধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু জয়ী কালাপাহাড় ঐ প্রতিমাকে স্বহস্তগত করিতে স্থির করিয়া অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার গুপ্ত আশ্রয়ের নির্ণয় করিয়া তাহা খনন করিয়া উড়িয়া লোকদের ঐ শ্রীজিউকে অর্থাৎ জগন্নাথকে তুলিলেন। পরে পুরীতে যত দেববিগ্রহ ছিল সকলকে ভাঙ্গিয়া তিনি ঐ জগন্নাথের প্রতিমাকে হস্তিপৃষ্ঠে গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত আনাইয়া তথায় বৃহৎকাষ্ঠরাশিতে অগ্নি দিয়া প্রতিমাকে প্রজ্বলিত চিতার উপরে ফেলিয়া দিলেন, কিন্তু নিকটবর্ত্তি কোন লোক তাহা অগ্নির মধ্যহইতে উদ্ধার করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিলেন, পরে জগন্নাথের কোন ভক্ত লোক অর্দ্ধদগ্ধ দেবকে জলের উপরে ভাসিতে দেখিয়া পশ্চাতে গিয়া গুপ্তরূপে তুলিয়া তাহার পবিত্র সার অর্থাৎ বিষ্ণুপঞ্জর লইয়া উড়িষ্যা দেশে উপস্থিত করিল। সে যাহা হউক, কিন্তু গজপতি ও গঙ্গাবংশীয় রাজগণ অতি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত যে রাজ্যের শাসন করিয়াছিলেন, সেই রাজ্যের স্বাধীনতার শেষ ঐ সময়ে হইল। কালাপাহাড়কর্তৃক উড়িষ্যা রাজ্যের পরাজয় হইলে পরে [illegible] পর্য্যন্ত দেশ শাসনরহিত থাকিল, পরে [illegible] রাজাদের [illegible]

লোকেরা সম্পূর্ণরূপে দেশের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ছিলেন, এই কারণে ঐ রাজা কেবল জমীদারমাত্র হইলেন।

১৫৭৩ শালে সলিমানের মৃত্যু হয়। তিনি আকবর শাহের বুদ্ধি ও পরাক্রম প্রযুক্ত প্রকাশরূপে স্বাধীন রাজা না হইয়া দিল্লীতে উপঢৌকন পাঠাইয়া নম্রতাপূর্ব্বক বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন, এই কৌশলে তাঁহার রাজত্ব স্থির থাকিল। তাঁহার পুত্র দায়ুদ খাঁ রাজা হইয়া ভাণ্ডারে অনেক ধন দেখিয়া বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন। লোকে বলে তাঁহার এক লক্ষ আশি সহস্র সৈন্য ও বিংশতি সহস্র কামান ছিল। পরে দায়ুদ খাঁ বাদশাহের কোন নিকটবর্ত্তি সৈন্যদল আক্রমণ করিলে আকবর তাহার সম্বাদ পাইয়া জোয়ানপুরের রাজপ্রতিনিধি মোনায়িম খাঁকে অনেক সৈন্য দিয়া বঙ্গ ও বেহার দেশের পরাজয় করিতে পাঠাইলেন। এবং হিন্দুজাতীয় তোদরমল নামক এক রাজা ঐ মোনায়িম খাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তৎকালে দায়ুদ খাঁ সসৈন্যে পাটনায় ছিলেন; অতএব বাদশাহের সেনাপতিগণ সেই নগর বেষ্টন করিলেন, এবং আকবর আপনিও উপস্থিত হইয়া হাজিপুরের খাদ্যদ্রব্যদ্বারা বিপক্ষগণের প্রতিপালন হয়, ইহা দেখিয়া হাজিপুর আক্রমণ পূর্ব্বক লইলেন, এবং তথাকার সৈন্যাধ্যক্ষের ও সৈন্য সকলের প্রাণদণ্ড করিয়া তাহাদের রাশীকৃত ছিন্ন মস্তকেতে এক নৌকা বোঝাই করিয়া ভয় দেখাওনার্থে দায়ুদ খাঁর নিকটে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তিনি অতি ত্রাসযুক্ত হইয়া বেগগামি নৌকাতে আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশে পলায়ন করিলেন, সুতরাং পাটনা বাদশাহের হস্তগত হইল। পরে বাদশাহ সসৈন্যে তেরিয়া গলি নামক

দুর্গম ঘাটে যাত্রা করিলে দায়ূদের যে সৈন্যগণ তথায় ছিল, তাহারা হাজিপুর রক্ষক সৈন্য সকলের গতি জ্ঞাত হইয়া প্রাণদণ্ডের ভয়ে ঐ স্থানকে পরিত্যাগ করিল। এই বিপদের সমাচার পাইয়া দায়ূদ নিজ ধন ও সৈন্য সকলকে সঙ্গে করিয়া উড়িষ্যা দেশে পলাইলেন; পরে সেই স্থানে আকবরের আজ্ঞাবহ মোগল লোকদের ও দায়ূদের আজ্ঞাবহ পাঠান লোকদের মধ্যে বিষম সংগ্রাম হইলে মোগল লোকেরা জয়ী হইল। তাহাতে দায়ূদ কটকে আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত নিষ্ফল বুঝিয়া বাদশাহের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহ তাঁহার নিবেদন গ্রাহ্য করিলে তিনি মোগলদের শিবিরে গিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া মুদ্রা দেওন পূর্ব্বক আকবরের আর বি-পক্ষতা না করিতে স্বীকার করিলেন। এই নিয়মে উড়িষ্যা দেশে তাঁহার যত ভূমি ছিল, সেই সকলের ভোগ করিতে অনুমতি পাইলেন।

অপর মোনায়িম খাঁ বাদশাহের তাবৎ সৈন্য সঙ্গে লইয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সেই স্থানে রাজধানী করিতে তাঁহার অভিপ্রায়ও ছিল। কিন্তু ১৫৭৫ শালে কোন অবিদিত কারণে অতিশয় মহামারী হইল; তাহাতে প্রতিদিন সহস্র ২ লোক মরে, এবং অবশি-ষ্টেরা মৃতদের সেবা করণে অক্ষম হইয়া শব সকল নদীতে নিক্ষেপ করে, তাহার দুর্গন্ধ প্রযুক্ত মরক আরও বৃদ্ধি পায়, তথাকার শাসনকর্ত্তাও প্রাণত্যাগ করেন, নগর একেবারে মনুষ্যশূন্য হয়, এবং তদবধি সেই স্থানে লোকালয় হয় না। উক্ত যে নগর দুই সহস্র বৎসরা-বধি নির্ম্মিত হইয়া পরিমাণেতে ও অট্টালিকাবলির সৌন্দর্য্যেতে ভারতবর্ষের সকল নগরের মধ্যে প্রধান,

এবং শত পুরুষ পর্য্যন্ত ভূপতিগণের রাজধানী ও ধন ও সুখের আশ্রয় ছিল, সেই নগর এক বৎসরমধ্যে বনতুল্য হইয়া ব্যাঘ্র ও বানর প্রভৃতির আশ্রয় হইয়া আসিতেছে। তাহার ইষ্টকনির্ম্মিত ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টকদ্বারা মুর্শীদাবাদ নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, কেবল মর্ম্মরাদি পাষাণে নির্ম্মিত দুই এক দৃঢ় গাঁথনি অদ্যাপি দেখা যাইতেছে। যে বৎসরে বঙ্গদেশ পুনরায় দিল্লী রাজ্যের এক প্রদেশ হয়, সেই বৎসরে তাহার অতি প্রসিদ্ধ পুরাতন রাজধানী প্রস্তরঢিবী হইল।

মোনায়িম খাঁর মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশের অবস্থা আরবার অস্থির হইল, ফলতঃ দায়ূদ খাঁ আপন দিব্য লঙ্ঘন করিয়া অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক মোগল লোকদিগকে বঙ্গদেশহইতে তাড়িয়া দিয়া পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যকে সংগ্রহ করিয়া রাজমহলে স্থিতি করিলেন। তাহাতে আকবরের সৈন্যসমূহ অবিলম্বে একত্রীকৃত হইয়া উক্ত নগর অবরোধ করিলে পাটান লোক পুরুষত্ব দেখাইয়া শত্রুনিবারণের চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের যত সেনাপতি ছিল, সকলে ক্রমে২ হত হওয়াতে সৈন্যরা শেষে অপ্রস্তুত হইয়া পলায়ন করিল। দায়ূদ আপনি ধরা পড়াতে মোগল সেনাপতি তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক আকবরের নিকটে প্রেরণ করিলেন। উক্ত দায়ূদের মৃত্যু হইলে, যে স্বাধীন রাজশ্রেণী দুই শত ছত্রিশ বৎসরাবধি বঙ্গদেশের শাসন করিয়াছিল তাহারও শেষ হইল, এবং যে পাটানেরা তিন শত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কালাবধি অর্থাৎ বখ্তিয়ার খিলজীকর্ত্তৃক দেশের পরাজয় হওনাবধি বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান হইয়াছিল, তাঁহাদেরও পরাক্রম নষ্ট হইল,

এবং মোগলদের হস্তগত হওয়াতে বঙ্গ ও বেহার দেশ ১৫৭৬ শালে মোগল রাজ্যের এক অংশ হইল।

পাঠানলোকদের অধিকারসময়ে প্রায় চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শাসন পশ্চাল্লিখিত নিয়মে হইত। রাজা কিম্বা রাজপ্রতিনিধি আপনার ভোগার্থে দেশের কোন২ অঞ্চল লইতেন, এবং অন্য যত ভূমি হিন্দু লোকদের হস্তহইতে অপহৃত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ভৃত্যগণকে দত্ত হইত, সেই ভৃত্যেরা তাহার বিভাগ করিয়া নিজ২ প্রজাগণকে বিতরণ করিতেন। ঐ সকল ভূমিহইতে রাজভৃত্যেরা যে কর পাইতেন, তাহার একাংশদ্বারা নিরূপিত সংখ্যক সৈন্যের প্রতিপালন করিতে হইত, অন্য এক অংশ তাঁহারা আপনারা ভোগ করিতে অনুমতি পাইতেন, এবং অবশিষ্ট অংশ রাজার ভাণ্ডারে পাঠাইতে হইত। হিন্দু জমীদারেরা আপন২ ভূমি হারাইয়া দরিদ্রতা প্রযুক্ত অতি ক্লিষ্ট হইতেন, তথাপি অনেকে পাঠান লোকদের সম্পত্তির রক্ষাকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া প্রতিপালিত হইতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজমহলের নিকটে দায়ূদ খাঁর পরাজয় হইলে পরে বাদশাহের সেনাপতি বেহার দেশ জয় করিয়া রোতাস নামক দৃঢ় দুর্গ লইলেন, এবং হত রাজার সম্পত্তি গ্রহণার্থে এক সৈন্যদল উড়িষ্যা দেশে প্রেরিত হইল, এবং কুচ বেহার দেশের রাজাও করাধীন হইলেন।

ইহার অল্প কাল পরে দেশে অতিশয় উপপ্লব হইল। মোগলজাতীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণ যে পাঠানদিগকে তাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের ভূমি সকল আপনারা ভোগ

করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু আকবর করদানের নিয়ম সুধরাইতে ইচ্ছুক হইয়া মোগল জমীদার সকলের নিকটে তাঁহাদের হস্তগত ভূমির যে রাজকর পাওনা ছিল, তাহার পরিশোধ চাহিলেন, এবং জমীদার সকলকে কেবল করগ্রাহক জ্ঞান করিয়া ক্রমে২ তাঁহাদের পরিবর্ত্ত করিতে স্থির করিলেন। ইহাতে অসম্মত হইয়া মোগলজাতীয়েরা মস্তক মুণ্ডন ও শোকসূচক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আপন২ আধুনিক প্রাপ্ত অধিকার অস্ত্রদ্বারা রক্ষা করিতে স্থির করিলেন। তাহাতে অকস্মাৎ আকবরের স্বজাতীয় ত্রিশ সহস্র অশ্বারূঢ় মোগল সৈন্য রাজদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশের রাজধানী আক্রমণ করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাদের ন্যায় বেহারদেশনিবাসি মোগল লোকেরাও সেই কারণে অস্ত্র ধরিয়া সমস্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, তাহাতে ১৫৮০ সালে বঙ্গ ও বেহার দেশ পুনরায় আকবরের রাজ্যহইতে পৃথক হইল। এই ঘটনাদ্বারা আকবরের রাজসিংহাসন টলটলায়মান হইল, যেহেতুক তাঁহার স্বজাতীয় সৈন্য রাজদ্রোহী হওয়াতে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ প্রযুক্ত আপনার কোন ভৃত্যকে আর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এইরূপ বিষম অবস্থাতে তিনি তোরলমল নামক এক হিন্দু রাজাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া রাজপুতজাতীয় হিন্দু সৈন্যসমূহকে দিয়া আপনার অবশীভূত ঐ দেশ সকল পুনরায় জয় করিতে পাঠাইলেন। সেই রাজা অতি উৎসুকরূপে কর্ম্ম চালাইলেন। তিনি সসৈন্যে বেহার দেশে প্রবেশ করিয়া রাজার বিপক্ষদিগের খাদ্যদ্রব্য যোগাইতে হিন্দু জমীদারদিগকে বারণ করিলেন, তাহাতে সেই বিপক্ষদের মধ্যে

অনেকে যুদ্ধে অক্ষম হইয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। কিন্তু রাজার বশীভূত অনেক সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে সৈন্য সকল একত্রে রাখা তাঁহার দুঃসাধ্য হইল। তাঁহাদের বিরক্ত হওনের কারণ এই, অনেকের নিকটে যে কর পাওনা ছিল, তাহার পরিশোধ দিল্লী বা-যোর উজীর চাহিয়াছিলেন। রাজা তারলমল বাদশাহের নিকটে ইহা নিবেদন করিলে বাদশাহ ঐ প্রধান মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিলেন। ইতঃকালে আকবরের ঐশ্বর্য্য অতি ক্ষীণ হওয়াতে তাঁহার অনেক ভৃত্য দীর্ঘকালাবধি তাহার সেবা করিলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে তাহাদের বাটীতে গিয়া বিনতিপূর্ব্বক তাহা-দিগকে পুনরায় রাজসভাতে আনিতে হইল। ইতিমধ্যে তিনি আজিম খাঁকে বেহার দেশের শাসনপদে নিযুক্ত করিলে সেই ব্যক্তি বিনয়দ্বারা রাজদ্রোহি সকলের মনকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টা নিষ্ফল হওয়াতে তিনি আগ্রাতে গমন করিয়া আকবরের নিকটে দেশের বিষম অবস্থা জানাইলেন। পরে হিন্দু ও মোগল এ দুই জাতীয় সেনাপতিগণের নিত্য অনৈক্য প্রযুক্ত রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না, ইহা বুঝিয়া বাদশাহ আপন সেনাপতি রাজা তারলমলকে পদচ্যুত করিয়া আজিম খাঁকে বঙ্গ-দেশের শাসনপদে নিযুক্ত করিয়া আপনার অপ্রয়োজনীয় সকল সৈন্যকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া তাঁহার অধীন করিলেন। ঐ নূতন সুবাদার রাজদ্রোহিদের মধ্যে পরস্পর হিংসা উত্থাপন করিয়া একে২ সকলকে বশীভূত করি-লেন, এবং কিঞ্চিৎ কাল পরে তণ্ডা নামক প্রধান নগরও তাঁহার অধীন হইলে ১৫৮২ শালে সমুদয় দেশ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল এবং যুদ্ধের শেষও হইল।

রাজা তারলমল সেনাপতি পদচ্যুত হইয়া বাদশাহের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, এমন অনুমান হয়, যেহেতুক অনেকে তাঁহাকে দেওয়ান তারলমল বলিয়াছে। ১৫৮২ শালে তিনি বঙ্গদেশের সকল জমীদারার নিয়মান্তর করিয়া নূতন ফর্দ প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে বঙ্গদেশ মোগল রাজ্যের অধীন হইলে পরে করাদানের যে প্রথম নিয়ম ঐ হিন্দুজাতীয় রাজকর্তৃক স্থাপিত হইল, সে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত থাকিল। বঙ্গদেশের খালিসা ও দত্ত ভূমির ওয়াসিল তুমর জমা, এই নামলিপিষ্ট উক্ত নিয়মপত্রানুসারে এই এক দেশহইতে এক কোটী সাত লক্ষ টাকা রাজকর আদায় হইত।

বঙ্গদেশ বাদশাহের বশীভূত হইলেও একেবারে সুস্থির হইল না, যেহেতুক উড়িষ্যা দেশস্থ পাঠানেরা বার বার তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিতেন। ১৫৮৯ শালে মানসিংহ নামক এক প্রসিদ্ধ রাজপুত্রজাতীয় লোক আকবরকর্তৃক সেই দেশের ও বেহার দেশের শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেলিম নামক যে রাজপুত্র জেহাঙ্গীর শাহ নাম পাইয়া বাদশাহ হইলেন, তিনি ঐ মানসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মানসিংহ শাসনপদ পাইয়া পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিতে উপক্রম করিলেন। তৎকালে পাঠানদের কতুল খাঁ নামক প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু প্রযুক্ত তাহারা ভগ্নমনা হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল, এবং স্বদেশীয় মুদ্রাতে বাদশাহের নাম অঙ্কিত করিতে স্বীকার করিলে তাহারা আপন২ ভূমি ভোগ করণের অনুমতি পাইল। কিন্তু দুই বৎসরান্তে তাহারা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া জগন্নাথের মন্দির স্বহস্তগত করিল, তাহাতে

মান সিংহ অবিলম্বে সসৈন্য হইয়া তাহাদের দেশে গমন করিলেন, এবং সুবর্ণরেখা নদীর তীরে সংগ্রাম হইলে পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া আরবার সন্ধি প্রার্থনা করিল। তাহাতে তাহারা আপনাদের সমস্ত হস্তি দিবে এবং অবশিষ্ট রাজকরও পরিশোধ করিবে, এই নিয়মে সন্ধি স্থির হইল।

পরে মান সিংহ উড়িষ্যা দেশহইতে প্রস্থান করিয়া রাজমহল রাজধানী করিলেন। তাহাতে এই যে নগর পূর্ব্বে নানা রাজা ও শাসনকর্তৃগণের বাসস্থান হইয়া মুসলমান লোকদের আগমনকালাবধি তাহাদের অমনো· যোগ প্রযুক্ত হ্রাস পাইয়াছিল, তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইল পুনরায় অতি সুন্দর ও খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিল। রাজা তথায় এক উত্তম পুরী নির্ম্মাণ করিয়া চতুর্দ্দিগে ইষ্টক ও পাষাণময় প্রাচীরদ্বারা সুদৃঢ় করিলেন। পরবৎসরে উড়িষ্যাদেশনিবাসি পাঠানেরা তৃতীয় বার রাজদ্রোহ করিয়া সৈন্যসামন্তদ্বারা বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যস্থান সাতগাঁ আক্রমণ করিয়া তথায় সঞ্চিত বহুমূল্য দ্রব্য লুট করিল, কিন্তু বাদশাহের সৈন্য তাহাদের বিপরীতে আগমন করিলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। ১৫৯৫ শালে কুচ বেহার দেশের রাজাও বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজ জ্ঞাতি লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহাকে কোন দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিল। অতএব তিনি মান সিংহের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলে মান সিংহ সসৈন্যে তাঁহার দেশে গমন করিয়া তাহা করাধীন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে মোগল লোকেরা কুচ বেহার দেশে কখনো প্রবিষ্ট হয় নাই। ১৫৯৮ শালে আকবর দক্ষিণ দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলে তাঁহার আজ্ঞামতে মান সিংহও

তাঁহার সহিত গেলেন। ইহা শুনিবামাত্র উড়িষ্যানিবাসি পাঠানদের ওস্মান নামক প্রধান লোক অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাদশাহের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন, এবং বঙ্গদেশেরও অধিকাংশ আক্রমণ করিয়া লইলেন, কিন্তু মান সিংহ শীঘ্র প্রত্যাগমন করিয়া শেরপুরের নিকটে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভব করিলেন। এই প্রকারে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত ন্যায্যরূপে ও সদ্বিচারপূর্ব্বক বঙ্গদেশের শাসন করিয়া মান সিংহ ১৬০৪ শালে শাসনপদ ত্যাগ করণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পরবৎসরে তাঁহার প্রভু ঐ মহাত্মা আক্বর পরলোক প্রাপ্ত হইলে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তৎকালে সমস্ত রাজ্যের মধ্যে মান সিংহের ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান আর কেহ ছিল না। তিনি স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় অতি সাহসিক ২০০০০ রাজপুত সৈন্যকে বেতন দিয়া রাখিতেন, এবং তাহারা তাঁহার সেনাতে অতিশয় আসক্ত হওয়াতে তিনি রাজ্যস্থিত সকল হিন্দু লোকদের মধ্যে প্রধান গণিত হইলেন। তাহাতে নূতন বাদশাহ তাঁহার ভগিনীপতি হইয়াও তাঁহাহইতে ভীত হওয়াতে শঙ্কানিবারণার্থে তাঁহাকে রাজসভাহইতে পৃথক করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু আট মাসের পরে তাঁহাকে পুনরায় আপন নিকটে আহ্বান করিলেন।

বাদশাহ অতি সুখ্যাত শের খাঁকে বধ করিতে মনস্থ করিলে মান সিংহ ঐ কর্ম্মে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন, এ কারণ বাদশাহ তৎকর্ম্মসাধনার্থে কতুব উদ্দিনকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এই উদ্দেশের কারণ এই, শের খাঁর ভার্য্যা মেহের উন নিসা ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালে পরমা সুন্দরী ছিল,

এবং তাহার স্বামী শের খাঁ অতি উচ্চপদস্থ ভদ্র লোক ছিলেন। তাঁহাদের বিবাহ হওনের পূর্ব্বে যুবরাজ জাহাঙ্গীর ঐ সুন্দরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অতএব শের খাঁর সহিত ঐ রমণীর বিবাহের সম্বন্ধ যেন ভঙ্গ হয় ও আপনার সহিত বিবাহ হয়, তিনি আপন পিতা আকবর বাদশাহের নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আকবর নিজ পুত্রের অনুরোধেও এমত অবিচার করিতে স্বীকার না করাতে ঐ সুন্দরী শের খাঁর পত্নী হইয়াছিল। তাহাতে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে অনেক প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শের খাঁর অত্যন্ত সাহস ও বল প্রযুক্ত সে সকলই বিফল হইল। পরে শের খাঁ রাজসভাতে আপনার রক্ষা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া ভার্য্যার সহিত বঙ্গদেশে গমন করিয়া বর্দ্ধমানের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইলেন। অনন্তর আকবর বাদশাহের পরলোক হইলে জাহাঙ্গীর ভারতবর্ষের প্রভু হওয়াতে ঐ সুন্দরীর প্রতি তাঁহার আসক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল, অতএব তিনি ধন প্রাণ পণপূর্ব্বক ঐ সুন্দরীকে গ্রহণ করিবেন, ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া শের খাঁকে বধ করিতে কুতুবকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে কুতুব বর্দ্ধমানে আগমন করিলে শের খাঁ তাঁহাকে অনুবর্জ্জিয়া লইতে দুই জন অশ্বারূঢ়ের সহিত বহিরাগমন করিলেন, এবং সুবাদারও মর্য্যাদাপূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে সুবাদার হস্তির উপরে আরোহণ করিলে তাঁহার পথে শের খাঁর অশ্ব আসিয়াছে, পূর্ব্বোপদিষ্ট এক জন পদাতী এই কথা কহিয়া সেই অশ্বকে আঘাত করিল। তাহাতে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহারা যে তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত, ইহা শের খাঁ দেখিয়া বীরের ন্যায় মরিতে

স্থির করিলেন। তাঁহার স্ত্রী যেমন অত্যন্ত সুন্দরী, তিনিও তদ্রূপ অত্যন্ত বলবান্, ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা সকলেই জানিত। তখন তিনি সাহসপূর্ব্বক হস্তির প্রতি আক্রমণ করাতে সুবাদার হস্তিহইতে নীচে পতিত হইলে শের খাঁ তাঁহাকে ছেদন করিয়া দ্বিখণ্ড করিলেন, এবং অন্য পাঁচ জন ভদ্র লোক আসিয়া তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিলে তাঁহারাও তদ্রূপ হত হইলেন। অবশিষ্ট লোকেরা চতুর্দ্দিগে ঐ বীরকে বেষ্টন করিয়া দূরহইতে এতত্ তীর ও গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে তাহাদ্বারা তিনি ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবশেষে পতিত হইলেন। অপর তাঁহার পত্নী স্বামিশোকে অধৈর্য্য না হইয়া কিছু দিন পরে জাহাঙ্গীরের ভার্য্যা হইল, এবং সর্ব্বলোকে সুবিদিত নূরজাহান নাম ধারণ করিয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন করিল।

১৬০৮ শালে সেখ ইস্লাম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া রাজধানী দক্ষিণ অঞ্চলে আনিয়া ঢাকা নগর পত্তন করিলেন। তাহার কারণ এই, বঙ্গদেশের যে২ অঞ্চল সমুদ্রতীরের নিকটবর্ত্তী আছে, সেই সকল অঞ্চলে তৎকালে পর্ত্তুগীষ জাতীয় নাবিকদের ডাকাইতী প্রযুক্ত লোকেরা অতিশয় ক্লেশ পাইত। ইউরপীয় লোকদের মধ্যে পর্ত্তুগীষ লোকেরা প্রথমে সমুদ্রপথে বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। ১৪৯৬ বৎসরে বাস্কো দি গামা নামক এক জন পর্ত্তুগীষ জাতীয় নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রথম বার উত্তমাশা নামক অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিমদিগস্থ সমুদ্রতীরে স্থিত কালিকত্ত নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই দেশের বাণিজ্যেতে পর্ত্তুগীষ লোকেরা অনেক লাভ দেখিয়া বারম্বার জাহাজ

পাঠাইয়া শেষে নানা স্থানে কিঞ্চিৎ২ ভুমির অধিকার পাইয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, এবং লঙ্কা উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়া লইল, এবং পূর্ব্বীয় সমুদ্রের নানা উপদ্বীপে আবাদ করিল; এই প্রকারে তাহাদের ভারতবর্ষে আগমনাবধি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক সময় গত হইলে তাহারা বঙ্গদেশেও উপস্থিত হইল। তাহারা কোন সময়ে প্রথমে হুগলি নামক স্থানে বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু বোধ হয় ১৫৯৯ শালের কতক বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিল, কারণ সেই বৎসরে তাহাদের নির্ম্মিত দুই গির্জ্জা সেই স্থানে ছিল, এবং সেই দুইয়ের মধ্যে একটা কাথীদ্রল অর্থাৎ প্রধান পাদ্রি সাহেবের গিরিজা ছিল। তাহাদের সেই বসতিস্থান দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় ছিল, এবং তাহার প্রাচীরে স্থাপিত কামানের কর্ম্মে অনেক ইউরপীয় গোলন্দাজ লোক নিযুক্ত ছিল। তাঁহাদের সৈনাসামন্ত ও বাণিজ্য প্রযুক্ত এ দেশে তাহাদের অধিক সমাদর জন্মিয়াছিল। তাহারা ঐ স্থানে আবাস করিয়াছিল, তাহার কারণ এই, সাতগাঁ নামক যে রাজকীয় বাণিজ্যস্থান তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল, সে অতি নিকটবর্ত্তী ছিল। প্রথমে ঐ আবাসের নাম গোলিন অর্থাৎ গোলা ছিল, পরে সময়ক্রমে বিদেশিদের বাণিজ্যেতে তাহার বৃদ্ধি হওয়াতে তাহা হুগলি নামে খ্যাত হইল।

তৎকালাবধি সাতগাঁ নগরের বাণিজ্য হ্রাস পাইতে লাগিল, কারণ পর্ত্তুগীযেরা তাহার অনেক অংশ আকর্ষণ করিল। তদ্ভিন্ন আর এক কারণ বলি, তাহা এই, অতি পূর্ব্বকালে ভাগীরথী নদীর অধিকাংশ জল সাতগাঁ

নগরের পার্শ্বে বহিয়া আমতা ও তমোলোকের নিকট দিয়া সমুদ্রে যাইত, কিন্তু পর্ত্তুগীষ লোকদের আগমন-কালে সেই খাল ক্রমশ শুষ্ক হইয়া গেল, এবং এখন যে নদী আছে, সেই হুগলির পার্শ্বস্থ নদী প্রধান হইতে লাগিল এমন বোধ হয়। ইহার একটি প্রমাণ এই, যে ভাগীরথী সম্প্রতি চুঁচুড়ার পূর্ব্বপার্শ্বদিয়া গমন করিতেছে, সেই নদী পূর্ব্বে ঐ স্থানের পশ্চিমে গমন করিত, এমত জনশ্রুতি তথাকার ওলন্দাজ লোকদের মধ্যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চলিত ছিল। যাহা হউক, কোন কারণে সাতগাঁ হ্রাস পাইল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে হুগলি বৃদ্ধি পা-ইতে লাগিল।

১৬১০ শালে পর্ত্তুগীষ জাতীয় দুঃসাহসি লোকদের এক দল চট্টগ্রামে ও আরাকান দেশে বসতি করিয়া সেই অঞ্চলের রাজগণের নিকটে কর্ম্ম করিতে লাগিল। তা-হারা জাহাজি কর্ম্মে অতি নিপুণ ও যুদ্ধে সাহসী হওয়াতে প্রতিবাসি সকলের ক্লেশজনক হইয়া উঠিল, এই কারণ আরাকান দেশের রাজা ১৬০৭ শালে আপন রাজ্য হইতে তাহাদিগকে লোপ করিতে স্থির করিয়া তাহাদের অনেক-কে বধ করিলেন, অবশিষ্টেরা নয় দশ খান নৌকাতে পলাইয়া সন্দ্বীপে আশ্রয় পাইয়া সামুদ্রিক চৌর্য্যবৃত্তি করিতে লাগিল। তাহাতে মোগল সুবাদার যত পর্ত্তুগীষ লোককে নিকটে পাইলেন, সেই সকলকে ধরিয়া বধ করিয়া ঐ নাবিক তস্করদিগের অন্বেষণার্থে যাত্রা করি-লেন। পরে তাহারা যে দক্ষিণ শাবাজপুরের নিকটে লঙ্গর ফেলিয়া ছিল, সেই স্থানে নাবিক সংগ্রাম হইলে মোগল লোকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, এবং পর্ত্তু-গীষেরা জয়ী হইয়া সন্দ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া গঙ্গালিস

নামক এক ব্যক্তিকে আপনাদের সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিল। তিনি মোগল সৈন্যগণকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাস্ত করিয়া প্রতিহিংসার চেষ্টাতে তাহাদের এক সহস্র লোককে বধ করিলেন। উক্ত গঞ্জালিস হঠাৎ মহারাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যান্বিত হইলেন, যেহেতুক এক সহস্র ইউরপীয় ও দুই সহস্র এতদ্দেশীয় পদাতিক ও দুই শত অশ্বারূঢ় সৈন্য এবং আশি জাহাজ তাঁহার অধীন হওয়াতে তিনি পদ্মা নদীর মুহানাতে স্থিত সকল উপদ্বীপ অধিকার করিলেন। তাহাতে নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র রাজগণ তাঁহার সহিত বন্ধুতার প্রার্থনা করিলেন। ১৬১০ শালে আরাকান দেশের রাজাও তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া পদাতিক ও নাবিক দুই প্রকার সৈন্যদ্বারা বঙ্গদেশ আক্রমণ করণের পরামর্শ করিলে তাঁহাদের দুই জনের সৈন্যসামন্ত একত্রীভূত হইয়া ভুলুয়া ও লক্ষ্মীপুর নগর পরাজয় করিল, কিন্তু মোগল জাতীয় অনেক সৈন্য তাহাদের বিপরীতে আসিয়া যুদ্ধ করিলে আরাকান দেশীয় সৈন্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল, এবং পর্ত্তুগীয় লোকেরাও কামানবাহি ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা সমুদ্রতীরের রক্ষা উপযুক্তরূপে না করাতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাড়িত হইল। এমন উপপ্লবের সময়ে বাঙ্গালার সুবাদার দেশাক্রমণকারি শত্রুদিগকে নিবারণের উপায় চেষ্টা করিয়া স্থানান্তর হইয়া ঢাকাতে রাজধানী করিলেন। পরে আরাকান দেশীয়দের পরাজয়হেতুক এবং সুবাদারের সতর্কতাহেতুক দেশের পূর্ব্বদিগস্থ অঞ্চল সুস্থির হইল বটে, কিন্তু অবিলম্বে পশ্চিমদিগস্থ অঞ্চলে উপপ্লব হইল। কারণ উড়িষ্যা দেশের দুর্দ্দান্ত পাঠানেরা আপনাদের বৃদ্ধ সেনাপতির পুত্র ওসমানকে প্রভুত্ব দিয়া

বঙ্গদেশ আরবার আক্রমণ করিতে স্থির করিল। তাহাতে সুবাদার প্রথমে এক জন রাজদূতদ্বারা তাহাদিগকে সুপরামর্শ দিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে বঙ্গদেশ চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত তোমাদের স্বজাতীয় পাঠানদের অধীন ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি পরমেশ্বর তাহা মোগল লোকদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব তোমরা যদি আরবার যুদ্ধ কর, তবে তোমাদেরই দোষে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু আত্মাভিমানী ওসমান বিংশতি সহস্র পাঠান সৈন্য আপনার আজ্ঞাবহ দেখিয়া যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন। অতএব মোগল লোকেরা দেশে আগমন করিলে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে সংগ্রাম হইল, তাহাতে পাঠানেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষত্ব দেখাইয়া শেষে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। ১৬১১ শালের এই ঘটনার পরে পাঠানেরা বঙ্গদেশ প্রাপ্ত হওনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া বশীভূত হইয়া উড়িষ্যা দেশের প্রধান২ গ্রামে বসতি করিতে লাগিল, এবং পাঠান নামে খ্যাত তাঁহাদের বংশোদ্ভব অনেক লোক অদ্যাপি সেই দেশে আছে।

ইতিমধ্যে সুবাদারদ্বারা পর্ত্তুগীস ও আরাকানীয় সৈন্যদের পরাভব হওনের অল্প কাল পরে গঞ্জালিস আরাকানীয় জাহাজ সকলের কর্ত্তাদিগকে নিমন্ত্রণের ছলে আপনার জাহাজে আনাইয়া বধ করিলেন; পরে তাহাদের জাহাজ লইয়া তীর দিয়া যাইতে২ আরাকান দেশ লুট করিলেন এবং আরাকান নগরও আক্রমণ করিলেন, কিন্তু হস্তগত করিতে পারিলেন না। তাঁহার এমন বিশ্বাসঘাতকতা প্রযুক্ত আরাকান দেশের রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তৎকালে গঞ্জালিসের যে ভাগিনেয় প্রতিভূ হইয়া তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাহাকে এক উচ্চপর্ব্বতের

চূড়াতে আনাইয়া পর্ত্তুগীয লোকদের দৃষ্টিগোচরে শূলে দিলেন। অনন্তর গোয়ানিবাসি যে পর্ত্তুগীয দেশাধ্যক্ষ ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের প্রধান ছিলেন, তাঁহার নিকটে গঞ্জালিস পত্র লিখিয়া আরাকান দেশ বশীভূত করা তাঁহার অনায়াসে সাধ্য হইবে, এমন কথা নিবেদন করিলেন। পরে সেই দেশাধ্যক্ষ অবিলম্বে জাহাজসমূহ প্রস্তুত করিয়া আরাকান দেশে পাঠাইলে নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ গঞ্জালিসের আগমনের অপেক্ষা না করিয়া একেবারে নদী দিয়া মধ্যদেশে গমন করিলেন, ইহা দেখিয়া আরাকানীয় লোকেরা সতর্ক হইল। কিঞ্চিৎ কাল পরে গঞ্জালিস ঐ নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত মিলিলে উভয়ের সৈন্যগণ আরাকান নগর আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হইল; ফলতঃ পর্ত্তুগীয়দের নাবিক সেনাপতি ও তাঁহার অধীন দুই শত সৈন্য হত হইলেন, এবং অবশিষ্টেরা পরাঙ্মুখ হইয়া গেল। এই পরাভবদ্বারা গঞ্জালিসও নষ্ট হইল, যেহেতুক কেহ তাঁহাকে আর বিশ্বাস করিল না, এবং তিনি সন্দ্বীপে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার সকল লোক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। আরাকানের রাজা অনেক জাহাজ ও সৈন্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিয়া সন্দ্বীপ ও তন্নিকটস্থ সমুদ্রতীরের সকল দেশ স্বহস্তগত করিয়া অতি দূর পর্য্যন্ত লোকালয় সকল উচ্ছিন্ন করিলেন, অর্থাৎ নগর ও গ্রাম সকল দগ্ধ করিয়া দেশের লোকদিগকে ধরিয়া দাসত্বাবস্থাতে রাখিলেন। তৎকালাবধি আরাকানীয় লোকেরা বার ২ সেই অঞ্চল আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করাতে শেষে সুন্দরবন হইয়া উঠিল, এমন অনুমান হয়। পূর্ব্বে সেই অঞ্চল ধনবান ও পরিশ্রমি লোকদের বাসস্থান ছিল, এমত অনেক প্রমাণ আছে;

ফলতঃ তথায় ভূমি খনন করিলে স্থানে২ মুদ্রা পাওয়া যায়, এবং বনের মধ্যে বৃহৎ অট্টালিকার কাঁৎড়া ও সুন্দর পুষ্করিণী দেখা যায়, সুতরাং তথায় পূর্ব্বকালে লোকালয় ছিল, কিন্তু মনুষ্যহীন হইলে সেই অঞ্চল একেবারে বন হইয়া বন্য পশুগণের আশ্রয় হইল।

১৬১৮ শালে মহারাণী নূরজাহানের ভগিনীপতি ইব্রাহীম খাঁ বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন; তাঁহারই অধিকারসময়ে ইংরাজ লোকেরা এই দেশে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৬০০ শালে লণ্ডন নগরের কতিপয় বণিকেরা এক সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া ইলিসাবেথ নাম্নী ইংলণ্ডের রাণীর নিকটে পূর্ব্বদিগস্থিত সকল দেশে বাণিজ্য করণের অনুমতিসূচক এক চার্টর অর্থাৎ রাজাজ্ঞাপত্র পাইয়াছিলেন। এইক্ষণে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের মহারাজ্য শাসন করিতেছেন, তাঁহার মূলস্বরূপ ঐ কতিপয় বণিকের সম্প্রদায়। তাঁহারা প্রথমত সৌরাষ্ট্রে এক বাণিজ্যস্থান করিয়াছিলেন, পরে যে নগরে বাদশাহের রাজধানী ছিল, সেই আগরা নগরে গমন করিয়া বাণিজ্য করিলেন। অপর বেহার দেশে অনেক২ বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্য আছে, ইহা শুনিয়া তাঁহারা ১৬২০ শালে দুই জন প্রতিনিধি লোককে পাটনায় প্রেরণ করিলে সেই দুই জন নানাপ্রকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া নৌকাদ্বারা আগরাতে পাঠাইতেন, পরে সেই দ্রব্য সকল স্থলপথে সৌরাষ্ট্রে নীত হইয়া তথাহইতে জাহাজদ্বারা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত। কিন্তু এত দূরহইতে দ্রব্য সকল সৌরাষ্ট্রে আনাইয়া বাণিজ্য করণের নিয়ম ব্যয়াধিক্য প্রযুক্ত অল্পকালস্থায়ী হইল।

ঐ ইব্রাহীমের অধিকারের প্রথম পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ অতি নির্ব্বিরোধ ও সৌভাগ্যযুক্ত ছিল, কারণ পূর্ব্বে আসাম ও আরাকান দেশীয়দের নিবারণ এবং উড়িষ্যার পাঠানদের সম্পূর্ণরূপে দমন হওয়াতে ঢাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ও মালদহের রেসমনির্ম্মাণ কর্ম্ম উত্তমরূপে চলিত, এবং বাণিজ্যও বর্দ্ধিষ্ণু হইল। পরে দৈবের ঘটনাতে ঐ দুর্ভাগ্য দেশ আরবার দুঃখেতে মগ্ন হইল। তাহার বিবরণ এই, জাহাঙ্গীর বাদশাহের তৃতীয় পুত্র শাহ জাহান এক দ্রোহ নিবারণার্থে দক্ষিণ দেশে প্রেরিত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে জরাগ্রস্ত জাহাঙ্গীর বাদশাহের যে চতুর্থ পুত্র ঐ সর্ব্ববিখ্যাতা নূরজাহান মহারাণীর প্রথম স্বামি শের নামক পাঠানের ঔরসে জাতা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে রাজ্য দিতে যত্ন করিয়া নূরজাহান শাহ জাহানের সৌভাগ্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতৃগণের মৃত্যু না হয়, তাবৎ আমার নিজ যত্ন ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়দ্বারা রাজ্য আমার হইবে না, ইহা বুঝিয়া শাহ জাহান সাধ্য পর্য্যন্ত যত্ন করিতে স্থির করিলেন। অনন্তর পারসী লোকেরা অকস্মাৎ রাজ্য আক্রমণ করাতে সেই রাজকুমার দক্ষিণ দেশ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করণের আজ্ঞা পাইলে তিনি তাহা না মানিয়া স্পষ্টরূপে রাজদ্রোহী হইয়া দিল্লীর প্রতি যাত্রা করণ পূর্ব্বক পিতাকে ভয় দেখাইয়া অনুপযুক্ত দাওয়া করিলেন। তাহাতে জাহাঙ্গীর সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে গমন করিলে শাহ জাহান যুদ্ধেতে পরাস্ত হইয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ দেশে পলাইয়া গেলেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান

হইলে তিনি অকস্মাৎ পূর্ব্বদিগে ফিরিয়া উড়িষ্যা দেশ দিয়া বঙ্গদেশে গমন করিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন।

শাহ জাহানের বর্দ্ধমানে আগমন হইবামাত্রে হুগলীস্থিত পর্ত্তুগালিদের শাসনকর্ত্তা মাইকেল রদ্রিগেস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, এবং রাজকুমারও তাঁহার অধীন গোলন্দাজের সাহায্য পাইতে অতি ইচ্ছুক হওয়াতে তাঁহার সমাদর করিলেন। কিন্তু শাহ জাহান কোন মতে কৃতকার্য্য হইবেন না, ইহা বুঝিয়া ঐ রদ্রিগেস সাহেব তাঁহার সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন, এবং রাজকুমার যে পর্য্যন্ত দিল্লীর রাজত্ব পাইয়া হুগলি নগর উচ্ছিন্ন করণদ্বারা প্রতিহিংসা না করিলেন, তাবৎ কাল তাঁহার সেই অপরাধ মনে রাখিলেন। পরে শাহ জাহান বঙ্গদেশ লুট করিতেং রাজমহলে উপস্থিত হইলে ইব্রাহীম খাঁ সুবাদার তাঁহার পশ্চাতে গমন করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। সেই যুদ্ধেতে ইব্রাহীম পরাস্ত ও হত হইলে জয়ী রাজকুমার ঢাকাতে গিয়া কোষহইতে চল্লিশ লক্ষ টাকা লইয়া দেশশাসনের নিয়ম স্থির করিয়া দিল্লীতে যাত্রা করিতে উদ্যোগ করিলেন। পথিমধ্যে তিনি মুঙ্গের ও পাটনা ও রোতাস পরাস্ত করিয়া আপন পরিবারকে নিরাপদে রাখিতে সেই রোতাস দুর্গে প্রেরণ করিলেন। পরে বারাণসীর দিগে গমন করিলেন, এবং বাদশাহের সৈন্য তাঁহার সহিত সংগ্রাম করণার্থে আসিতেছে, এমত সংবাদ পাইয়া তন্সা নদীর তীরে ব্যূহরচনা করিলেন। সেই স্থানে নিষ্ঠুররূপে যুদ্ধ হইলে শাহ জাহান পরাভূত হইলেন, এবং শত্রুগণ তাঁহার পশ্চাতে ২ ধাবমান হওয়াতে তিনি যে পথ দিয়া বঙ্গদেশেতে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া পুনরায় দক্ষিণ দেশে পলায়ন

করিলেন। তথাহইতে তিনি আপন পিতাকে এক মনস্তাপসূচক পত্র লিখিলে পিতা তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তাহাতে তিনি যে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার কোন চিহ্নও থাকিল না।

শাহ্ জাহানের এই বিদ্রোহ নিবারণের পরে যে খানেজাদ খাঁ সুবাদার হইয়া অল্প কাল পর্য্যন্ত দেশের শাসন করিলেন, তিনি বাইশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিল্লীতে পাঠাইলেন. এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কর্ম্ম উল্লেখের যোগ্য নহে। অনেক বৎসরের পরে সেই মুদ্রা প্রেরিত হইল, যেহেতুক আরাকানীয় ও পর্ত্তুগীয় লোকদের আক্রমণ ও রাজকুমারের উপদ্রোহ নিবারণে সমুদয় রাজস্ব ব্যয় হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গদেশ অতি নির্লাভ ছিল, তাহার প্রমাণ এই, ১৬২৭ শালে যে ফিদাই খাঁ সুবাদার হইলেন, তিনি প্রতিবৎসর বাদশাহ্ ও মহারাণী উভয়ের নিকটে পাঁচ২ লক্ষ মুদ্রা পাঠাইতে স্বীকার করিয়াছিলেন, এই কারণে সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

৫ অধ্যায়।

১৬২৮ শালের আরম্ভকালে জাহাঙ্গীরের পরলোক হওয়াতে শাহ্ জাহান রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অবিলম্বে কসিম্ খাঁকে বঙ্গদেশের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। কসিম খাঁ আপন অধিকারের প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় বৎসরে পত্রদ্বারা বাদশাহের নিকটে এই নিবেদন করিলেন, যে কতিপয় ইউরপীয় (অর্থাৎ পর্ত্তুগীয়) পৌত্তলিক লোক বাণিজ্যার্থে হুগলিতে বসতি করণের অনুমতি পাইয়াছিল, তাহারা সম্প্রতি সৈন্যাদিদ্বারা আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিয়া দুঃসাহসী হইয়া যত নৌকা তাহাদের

আবাসের নিকট দিয়া গমন করে, সেই সকলের নিকটে কর লইতেছে, এবং নদীগণের মুহানাতে নাবিক চৌর্য্যবৃত্তি করিতেছে, এবং সপ্তগ্রামের বাণিজ্য বিনষ্ট করিয়াছে, এবং আমার রাজকর্ম্মসাধনে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। তাহাতে বাদশাহ বিরক্ত হইয়া, পূর্ব্বে যখন আমি বর্দ্ধমানে ছিলাম, তৎকালে মাইকল রদ্রিগেজ আমার সাহায্যার্থে গোলন্দাজ লোক দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়া পর্ত্তুগীস লোকদিগকে রাজ্যহইতে তাড়িয়া দিতে শুবাদারকে আজ্ঞা করিলেন।

অনন্তর কাসিম খাঁ ১৬৩১ শাকে পর্ত্তুগীস লোকদের সহিত যুদ্ধ করণের উপায় চেষ্টা করিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে অতি গুপ্তরূপে দেশের তিন স্থানে তিন সৈন্যসমূহ প্রস্তুত করিলেন; পরে শেরপুর (কিম্বা শ্রীরামপুর) নামক স্থানে নৌকাদ্বারা এক সেতু বন্ধ হইলে বাদশাহের সৈন্যগণ ১৬৩২ শাকে নদী পার হইয়া হুগলি নগর বেষ্টন করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত অবরোধ করিল। পর্ত্তুগীস লোকেরা এক লক্ষ মুদ্রা উপঢৌকন দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু মোগল লোকেরা তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করাতে তাহারা গোয়াহইতে সাহায্য প্রাপ্তির অপেক্ষাতে থাকিতে২ বীরত্ব দেখাইয়া শত্রু নিবারণে এমত যত্ন করিল, যে তাহাদের বন্দুকহইতে মোগলদের অতিশয় ক্লেশ জন্মিল। অবশেষে মোগল লোকেরা বলেতে সেই স্থান পরাস্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া সুড়ঙ্গ কাটিতে স্থির করিল। অতএব প্রাচীরের নীচে সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদেতে পূরিয়া তাহাতে অগ্নি দিলে প্রাচীরের এক ভাগ অনুপরিচ্ছিন্ন মনুষ্যসমূহ উড্ডীয়মান হইল। এইরূপে মহাছিদ্র পাইয়া মোগলেরা শীঘ্র দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়া পর্তুগীস লোকদিগকে নির্দ্দয়রূপে বধ করিতে লাগিল, পরে অনেকে নিকটবর্ত্তি জাহাজে পলাইলে সকলের মধ্যে বড় যে জাহাজে দুই সহস্র লোক আশ্রয় লইয়াছিল, যবনেরা তাহাও আক্রমণ করিল; তাহাতে জাহাজের কর্ত্তা তাহা শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইয়া বারুদাগারে অগ্নি দিয়া সেই জাহাজ উড়াইয়া দিলেন, এবং অন্য২ অনেক জাহাজও স্ব২ কর্ত্তাদ্বারা কিম্বা শত্রুদের দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া নদীতে ভাসিয়া গেল, তাহাতে সেতুতে অগ্নি লাগিলে তাহাও দগ্ধ হইল। ছোট বড় সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত নৌকা তথায় লঙ্গর ফেলিয়াছিল, কিন্তু সেই সকলের মধ্যে কেবল তিনখানমাত্র রক্ষা পাইল। পরে জয়ি শত্রুগণ নগর লুট করিয়া গিরিজা ও তন্মধ্যস্থ পুত্তলিকা সকল নষ্ট করিল। সেই যুদ্ধেতে এক সহস্র পর্তুগীস লোক হত হইল, এবং বালক বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্বশুদ্ধ চারি সহস্র চারি শত জন ধরা পড়িয়া বন্দী হইল। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা পাদ্রি ছিলেন, তাঁহারা রাজসভাতে প্রেরিত হইলেন, এবং সুন্দরী স্ত্রী সকল দিল্লীতে শাহ্ জাহানের অন্তঃপুরে নীত হইল। হুগলি নগর এই প্রকারে মোগল লোকদের হস্তগত হইয়া বঙ্গদেশের রাজকীয় বাণিজ্যস্থান হইল। তাহাতে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত যত লোক সাতগাঁ নগরে ছিল, তাহারা এবং তাহাদের হস্তগত সকল পত্র প্রভৃতি হুগলিতে আনীত হইলে ঐ সাতগাঁ (অর্থাৎ সপ্তগ্রাম) পনেরো শত বৎসর পর্য্যন্ত অতি উন্নত হইয়া শেষে পল্লীগ্রামের সমান হইল। পরে হুগলিতে এক জন ফৌজদার অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ স্থাপিত হইলেন, এবং তাঁহার হস্তে পুলীসের অর্থাৎ চোরাদি দুষ্ট লোক দমনের ভার সমর্পিত হইলে

যত বিচারস্থানে চৌর্য্যাদি দোষের বিচার হয়, কালক্রমে সেই সকলের ফৌজদারী নাম হইল। ঐ ১৬৩২ শালে কাসিম খাঁ সুবাদার পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

হুগলির পরাস্ত হওনের দুই বৎসর পরে ইংরাজেরা বাদশাহের নিকটে বঙ্গদেশে সামুদ্রিক বাণিজ্য করণের অনুমতিপত্র পাইলেন। তাহা বোটন সাহেবের মাহাত্ম্য-দ্বারা সম্পন্ন হইল। ফলতঃ ১৬৩৪ শালে যে সময়ে শাহ জাহান বাদশাহ আপন সৈন্যের নিকটে দক্ষিণ দেশে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার এক কন্যার বস্ত্রেতে হঠাৎ অগ্নি লাগিলে সেই রাজকুমারী অগ্নিজ্বালাতে অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন। তাহাতে ইংরাজ জাতীয় কোন চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করণার্থে এক দূত সৌরাষ্ট্রে ইংরাজ বণিকদের নিকটে প্রেরিত হইলে কোম্পানির কোন জাহাজের চিকিৎসক ঐ বোটন সাহেবের প্রতি আজ্ঞা হইলে তিনি গমন করিয়া ঐ রাজকুমারীকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থা করিলেন। ইহাতে বাদশাহ পরমাহ্লা-দিত হইয়া তিনি যে পুরস্কার প্রার্থনা করিবেন, তাহাই দিতে স্বীকার করিলে ঐ সাহেব আপনার লাভজনক কোন বর না চাহিয়া ইংরাজ লোকেরা যাহাতে রাজকর ব্যতিরেকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে এবং কারখানা স্থাপন করিতে পারেন এমন আজ্ঞা হউক, এই নিবেদন করিলেন, এবং বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বীকৃত হই-লেন। কিন্তু দেশের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে ইউরপীয় লোকদের আবাস করা আশঙ্কার বিষয়, ইহা পর্ত্তুগীষদের উপলক্ষ্যে জ্ঞাত হইয়া বাদশাহ ইংরাজদের কারখানার নিমিত্তে বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তি পিপ্পলী নামক স্থানকে মনোনীত করিলেন। যে ইংরাজ লোকেরা প্রভৃতি সমস্ত

ভারতবর্ষের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের এই দেশে প্রথম আগত জাহাজ ১৬৩৪ শালে সেই পিপ্পলীতে লঙ্গর ফেলিল, এবং বোটন সাহেব দেশের মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া রাজাজ্ঞাপত্র আনিয়া অনায়াসে মূল্য ক্রয় পূর্ব্বক জাহাজের বোঝাই করিলেন। পিপ্পলী স্থানে ইংরাজ লোকেরা প্রথম বসতি করিলে পরে চারি বৎসরান্তে ওলন্দাজ লোকেরাও তথায় আপনাদের প্রথম কারখানা করণের অনুমতি পাইলেন।

১৬৩৮ শালে ইসলাম খাঁ মুসমেদী নামক এক জন সুপরীক্ষিত বৃদ্ধ লোক বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন। তাঁহার অধিকারের প্রথম বৎসরে আরাকানীয় রাজার ভৃত্য যে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা মুকুট রায়, সে আপন প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চট্টগ্রাম মোগল লোকদের হস্তগত করিলেন। ঐ স্থান পূর্ব্বে ত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্যের এক অংশ ছিল, পরে মুসলমানেরা তাহা পরাক্রান্ত করিলে পাঠান ও মোগল লোকদের পরস্পর বিরোধকালে আরাকানীয় রাজা তাহা প্রাপ্ত হইল। শেষে তাহা ইসলাম সুবাদারের হস্তগত হওয়াতে তাঁহার নামানুসারে ইসলামাবাদ এই নূতন নাম পাইল। ইতিমধ্যে আসাম দেশের রাজা পাঁচ শত নৌকা প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আগমন করিয়া বাণের ন্যায় বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত করিলেন, এবং পথে স্থিত সকল নগর ও গ্রাম লুট করিলেন। কিন্তু সুবাদার অনেক কামানবাহি নৌকা লইয়া তাঁহার বিপরীতে গমন করিলে আসামীয়েরা তাঁহার নিবারণে অসমর্থ হইল, এবং আহমদের নৌকা সকল নষ্ট হইলে লোকদের এককালে ভূমি পাইল বটে, কিন্তু চারি সহস্র জন হত হইয়াছিল। পরে ইসলাম খাঁ আসামের দেশ পর্য্যন্ত

যুদ্ধযাত্রা করিয়া অনেক দ্রব্য লুট করিলেন, এবং পানেরো দুর্গও লইলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অধিকারসময়ে যবনেরা কুচবেহার দেশ আক্রমণ করিল। সেই ইস্লাম খাঁ কেবল এক বৎসরমাত্র দেশের শাসন করিলেন।

১৬৩৯ শালে শাহ্ জাহান বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র সুল্তান সুজা চৌব্বিশ বৎসর বয়সে বঙ্গদেশের সুবাদার হইয়া প্রায় বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক দেশের শাসন করিলেন। তৎকালে কোন সন্দেহ প্রযুক্ত বেহার প্রদেশ স্বতন্ত্র রাজ্যাংশ করা গিয়াছিল। সুজা কর্ত্তৃত্বপদ পাইবামাত্র রাজধানী ঢাকাহইতে রাজমহলে আনিয়া ঐ স্থান নানা সুন্দর গাঁথনিদ্বারা সুশোভিত করিলেন, এবং মান সিংহ যে প্রাচীরদ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাহা আরও সুদৃঢ় করিলেন। কিন্তু পর-বৎসরে নগরের অধিকাংশ পুড়িয়া গেল, কেবল তাহা নহে, অনেক২ অট্টালিকাও গঙ্গা নদীদ্বারা নষ্ট হইল। তাহার কারণ এই, গঙ্গা নদী পূর্ব্বে গৌড় নগরের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছিল, কিন্তু তৎকালে সেই পুরাতন খাল ত্যাগ করিয়া অতি বেগে রাজমহলের প্রতি বহিতে লাগিল। পূর্ব্বে রাজসভা গৌড় নগরহইতে স্থানান্তর হইয়াছিল, সম্প্রতি নদীও তাহা ত্যাগ করাতে সেই স্থান সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জন হইল। পরে অগ্নি ও নদীর জলদ্বারা যে ক্ষতি জন্মিয়াছিল, শাহ্ সুজা তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক শোধন করাতে রাজমহল নগর পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়া উঠিল।

শাহ্ সুজার রাজমহলে আগমনের পরে বোটন সাহেব তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে গেলেন। এবং তৎকালে তাঁ-হাঁর সুখ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হওয়াতে শাহ্ সুজা

তাঁহার নিকটে আপনার এক জন রাণীর ভারি পীড়ার কথা জানাইয়া সেই পীড়ার উপশমের উপায় প্রার্থনা করিলেন। পরে তাঁহার চেষ্টাতে সেই রাণী সুস্থা হইলে তিনি রাজসভাস্থ সকলের প্রিয়পাত্র হইলেন, এবং সুজা তাহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুরোধে ইংরাজ লোকদিগকে পিপ্পলী ও বালেশ্বর ও হুগলি এই তিন স্থানে কারখানা স্থাপন করিবার অনুমতি দিলেন। সুজা অতি সদ্বিচার পূর্ব্বক আট বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শাসন করিলে পরে তাঁহার পিতা দ্বেষ ও ভয়জন্য কোন সন্দেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে আপনার নিকটে আহ্বান করিয়া কাবল দেশের শাসনকর্তৃত্বপদ দিলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে তিনি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশের সুবাদার হইয়া অন্য নয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহার শাসন করিলেন। সেই সময়ে দেশের অতি উত্তম অবস্থা ছিল, ফলতঃ শিল্পকর্ম্ম ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইল, এবং ইউরপীয় বণিক্‌গণদ্বারা স্বর্ণরূপ্যের বাহুল্য আনীত হইল। তাহাতে রাজমহলের রাজসভা দিল্লীর রাজসভার তুল্য হইল। দেশের শাসন অতি ন্যায্যরূপে হইত, এবং সুবাদার আপন মিষ্ট আলাপ ও কোমল স্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। অনেক শত বৎসরের পরে তৎকালে প্রথম বার দেশের এমত মঙ্গল নয় বৎসর পর্য্যন্ত থাকিল।

নয় বৎসরের শেষে ঐ সুখাবস্থার পরিবর্ত্তে যে যুদ্ধাদিজন্য দুঃখের সময় উপস্থিত হইল, তাহার বিবরণ করণের অগ্রে রাজকরের বৃদ্ধির কথা সংক্ষেপে কহিব। ১৬৫৭ শালে শাহ সুজার আদেশানুসারে বঙ্গদেশের রাজস্বের নূতন নিয়মপত্র লিখিত হইয়াছিল। মোগলদের অধিকারসময়ে ১৫৮২ শালে দেওয়ান তোরলমলকর্তৃক

প্রকাশিত যে নিয়মপত্রানুসারে দেশের রাজকর এক কোটি সাত লক্ষ টাকা ছিল, তাহার পরে রাজকর অনেক বৃদ্ধি পাইলে শাহ সুজা কর্তৃক স্থাপিত নিয়মানুসারে এক কোটি একত্রিশ লক্ষ টাকা হইল। সুতরাং পাঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে রাজকর চৌব্বিশ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ উড়িষ্যা ও কুচবেহার ও ত্রিপুরা এই তিন দেশ পরাস্ত করণের এবং এক টঙ্কশালা স্থাপন করণের ফল ছিল, অবশিষ্ট দশ লক্ষ তোরলমলের নিয়মপত্রে উল্লেখিত ভূমির কর বাড়াওনের ফল ছিল। এই এক কোটি একত্রিশ লক্ষ টাকার রাজকরের মধ্যে ন্যূনাতিরেক চোয়াল্লিশ লক্ষ টাকা দেশের শাসন এবং পদাতিক ও নাবিক সৈন্য প্রতিপালন প্রভৃতি সমস্ত রাজকর্ম্ম চালাওনার্থে ব্যয় হইল, সুতরাং বঙ্গদেশহইতে প্রতি বৎসর ব্যয়াতিরিক্ত সাতাশি লক্ষ টাকা লাভ উৎপন্ন হইল। সেই সময়ের ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ফিদাই খাঁ প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা রাজকর দিল্লীতে পাঠাইতে স্বীকার করাতে সুবাদার হইয়াছিলেন, ইহা মনে করিলে বোধ হয় সেই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেশের মঙ্গল অধিক বাড়িয়াছিল। সেই মঙ্গলের এক কারণ উত্তম রাজ্যশাসনে প্রজাদিগের যত্ন, কিন্তু প্রধান কারণ ইংরাজ ও ওলন্দাজ লোকদের বাণিজ্যকর্ম্ম।

১৬৫৭ সালে শাহ সুজার পিতা দিল্লীর শাহ জাহান বাদশাহ অতিশয় পীড়িত হইলে তাঁহার চারি পুত্র সকলে রাজত্ব পাইতে যত্ন করিলেন। বিশেষতঃ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা যদি রাজা হইবেন, তবে আমি কারাবদ্ধ কিম্বা হত হইব, শাহ সুজা [illegible] জ্ঞাত হইয়া রাজত্ব পাইতে চেষ্টিত হইলেন। এবং [illegible] তাঁহার বহুসংখ্যক [illegible]

সৈন্য এবং মুদ্রাতে পরিপূর্ণ কোষ এবং বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত প্রজাসমূহ প্রভৃতি অনেক উপায় ছিল। অতএব তাঁহার পিতার পরলোক হইয়াছে, এমন সম্বাদ তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকটে জানাইলেন, এবং ঐ সম্বাদের বিপরীত কোন পত্র আইলে তিনি তাহা আপন ভ্রাতা দারার কল্পিত পত্র বলিতেন। পরে তিনি সসৈন্যে বারাণসীর দিগে যাত্রা করিলে দারা আপন পুত্র সলিমানকে এবং জয় সিংহ নামক রাজপুতজাতীয় সেনাপতিকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। জয় সিংহের প্রস্থান করণের পূর্ব্বে বৃদ্ধ বাদশাহ তাঁহাকে বিরলে আপনার নিকটে আনাইয়া যাহাতে যুদ্ধ না হইয়া ভ্রাতাদের মিলন হয় এমন চেষ্টা করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে যে সময়ে সুজা নদী পার হওনার্থে বারাণসীর নিকটে সেতু বান্ধিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতার সৈন্যগণ নদীর অন্য পারে উপস্থিত হইল। তাহাতে জয় সিংহ অবিলম্বে সন্ধির চেষ্টা করিয়া স্বীয় পিতার ও ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করা যে অতি অনুপযুক্ত কর্ম্ম, ইহা তাঁহাকে দেখাইলে সুজা তাঁহার সুপরামর্শ মানিয়া শান্তিরূপে বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু যুবা সলিমান যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষী হইয়া অল্প জলে আচ্ছাদিত যে কোন চড়ার সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই চড়া দিয়া রাত্রিযোগে জয় সিংহের অজ্ঞাতসারে আপন সৈন্যগণকে পার করিয়া সুজার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। শাহ সুজা অস্ত্রাঘাতের শব্দে জাগ্রত হইয়া শীঘ্র হস্তি আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ অকস্মাৎ ভীত হইয়া পলায়ন করিলে তিনি বার২ তাহাদিগকে সুস্থির করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে আপনি পলাইয়া [illegible] পাটনাতে পরে মুঙ্গেরে আ-

শ্রয় লইলেন। এবং সলিমানও মুঞ্জের অবরোধ করণার্থে শীঘ্র তাঁহার পশ্চাতে গমন করিলেন, কিন্তু মরদ ও আওরঙ্গজেব নামক দুই পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধ করণার্থে পিতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সেই যুদ্ধেতে গেলেন, তাহাতে তারা পরাস্ত এবং বৃদ্ধ শাহ জাহান বাদশাহ কারাবদ্ধ হইলে আওরঙ্গজেব দিল্লীর রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্ব প্রাপ্ত হওনের সম্বাদ শুনিয়া শাহ সুজা বজ্রাঘাতে আহত লোকের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইলেন, যেহেতুক আওরঙ্গজেব কাহারো অপরাধ কখনো ক্ষমা করেন না, ইহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন, তথাপি তিনি স্বীয় ভ্রাতার নিকটে দূত পাঠাইয়া মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে স্থিরীকৃত হইতে প্রার্থনা করিলেন। আওরঙ্গজেব উত্তর করিলেন, আমি কেবল পিতার প্রতিনিধিরূপে দেশের শাসন করিতেছি, তোমাকে আরবার নিযুক্ত করণের কোন প্রয়োজন নাই। শাহ সুজা আপন ভ্রাতার এই ছলের কথাতে বিশ্বাস করিলেন না, যেহেতুক আওরঙ্গজেব যাবৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাবৎ পর্য্যন্ত আমার মঙ্গল হওয়া অসম্ভব, ইহা তিনি বিলক্ষণরূপে জানিলেন। অতএব রাজত্বপ্রাপ্তির জন্যে আরবার যুদ্ধ করিতে স্থির করিয়া তিনি ১৬৫৭ শালে বিস্তর সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করিলেন। পরে কজুয়া স্থানে বাদশাহের সৈন্যগণ সুজার নিকটে উপস্থিত হইলে যুদ্ধ হওনের পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যাকালে আওরঙ্গজেবের এক বৃহৎ সৈন্যদল সুজার পক্ষীয় হইল, তাহাতে শাহ সুজা যদি নিপুণ সেনাপতি হইতেন, তবে অবশ্য জয়ী হইতেন। পরদিনে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাঁহার সৈন্যগণ প্রথমে জয়ী হইল, পরে সুজার বাহন হস্তী আওরঙ্গজেবের হস্তির

অতি নিকটবর্ত্তী হইলে ভয়ানক সংগ্রাম হইল, তাহাতে বাদশাহের হস্তী অতিশয় ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে বাদশাহ নামিতে উদ্যত হইলে তাঁহার সেনাপতি মীর জুমলা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে আওরঙ্গজেব, নামিলে আপনি রাজসিংহাসন হইতে নামিলেন। তাহাতে বাদশাহ চেতন পাইয়া সেই অবাধ্য বাহনকে দাঁড় করাওনার্থে তাহার পদ বান্ধিতে আজ্ঞা দিয়া আরও যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি সুজার সৈন্যগণ পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল, এবং তাঁহার হস্তী অবাধ্য হইলে তিনি অশুভ ক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার সৈন্যগণ আপনাদের প্রভুকে আর না দেখাতে সর্ব্বদিগে পলায়ন করিলে সুজা একাকী পাটনাতে প্রত্যাগমন করিয়া তথা হইতে মুঙ্গেরে গমন করিলেন। পরে আওরঙ্গজেব আপন পুত্র মুহম্মদকে ও মীর জুমলা নামক সেনাপতিকে তাঁহার পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন, এবং প্রেরণকালে এই আজ্ঞা দিলেন, সুজা যাবৎ ধৃত না হয় তাবৎ তোমরা ক্ষান্ত হইবা না। অতএব তাঁহারা মুঙ্গের অবরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুজার সৈন্যগণ অগ্রে তথায় উপস্থিত হইয়া একত্রীভূত হওয়াতে, এবং নগরের প্রাচীরাদি দৃঢ়ীকৃত হওয়াতে অবরোধদ্বারা তাঁহার পরাজয় অনেক বিলম্বের কর্ম্ম হইল। এই জন্যে মীর জুমলা শীকরগলি পর্ব্বত দিয়া বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হওনের যে অন্য পথ আছে তাহার উপলব্ধি পাইয়া সেই পথ দিয়া এক সৈন্যদল পাঠাইলে তাহা ঝড়ের ন্যায় অকস্মাৎ নিম্ন ভূমিতে উপস্থিত হইল।

সুজা এই দুর্ঘটনার সম্বাদ পাইবামাত্র ঐ প্রাচীরবেষ্টিত স্থান ত্যাগ করিয়া রাজমহল পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় ছয় দিন পর্য্যন্ত শত্রুগণকে নিবারণ করিলে পর

কোন ঝড়যুক্ত অন্ধকারময় রাত্রির সুযোগ পাইয়া সমস্ত সৈন্যের সহিত নৌকাযোগে নদী পার হইয়া তন্দা পর্য্যন্ত গমন করিলেন। সেই রাত্রিতে বর্ষাকালের আরম্ভ হওয়াতে মীর জুম্লাকে আপন সৈন্যগণকে তাম্বুতে বাস করাইয়া বর্ষাকালের শেষ পর্য্যন্ত রাজমহলের নিকটে নিষ্কর্ম্মে থাকিতে হইল। ইতিমধ্যে সুজা আপন সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বেতনগ্রাহি পর্ত্তুগীজ গোলন্দাজ লোকদের দল সংগ্রহ করিয়া কৃতকার্য্য হওনের ভরসা পাইলেন। এবং বাদশাহের পুত্র মহম্মদ অকস্মাৎ শাহ সুজার এক কন্যার সৌন্দর্য্যেতে মুগ্ধ হইয়া আপন সৈন্য ত্যাগ করিয়া সুজার পক্ষে আইলেন। তৎকালে মীর জুম্লা কোন দূরস্থ স্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ঘটনার সম্বাদ পাইবামাত্র তিনি ত্বরায় সৈন্যের নিকটে গমন করিলেন, কারণ রাজকুমারের সহিত তাবৎ সৈন্য শত্রুর পক্ষীয় হইয়া থাকিবে, তিনি এমন সন্দেহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনসময়ে সমস্ত ছাউনীতে গোলযোগ হওয়াতে অনেকে শত্রুর পক্ষে যাইতে উদ্যত ছিল, এবং অন্যেরা সকল দ্রব্য লুটপাট করিতেছিল, কিন্তু তাঁহার দেখা পাইয়া সকলে আজ্ঞাবহ ও সুস্থির হইল। পরে ঐ রাজকুমার এইরূপে আপন পিতার ক্রোধ জন্মাইয়া অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া, এবং বর্ষাকাল অতীত হইবামাত্র আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, ইহা অঙ্গীকার করিয়া তিনি নৌকা সংগ্রহ করণের আজ্ঞা দিলেন। মহম্মদের আগমনে সুজা আনন্দেতে পুলকিত হইয়া ঘটা পূর্ব্বক তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজসভা আহ্লাদে মগ্ন ছিল। এমন সময়ে নদীর হ্রাস হইলে মীর জুম্লা সুজার নিকটে অল্পজলযুক্ত কোন স্থান পা-

হইয়া সৈন্য পার হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে সুজা অবিচারপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া পরিশ্রম করিলেন। এবং সেই যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে নিরুপায় হইয়া আপন জামাতার সহিত ঢাকাতে পলায়ন করিলেন। ইতিমধ্যে জাফর মীর জুমলা তথা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া দেশশাসনের নিয়ম করণে তথায় কিছু দিন থাকিলেন। পরে [illegible] গমন করিলেন; তৎকালে সুজার সৈন্য সাকুল্যে অল্প লোকমাত্র ছিল, এবং সাধারণের প্রতি তাঁহার বৈরভাব হওয়াতে তিনি মক্কাতে তীর্থযাত্রা করিয়া তথায় পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে২ আপন আয়ুর অবশিষ্ট কাল যাপন করিতে স্থির করিয়াছিলেন। অতএব আপন পরিবার ও সম্পত্তি হস্তির উপরে চড়াইয়া চল্লিশ জন সিপাহি সঙ্গে লইয়া ত্রিপুরা দেশ দিয়া চট্টগ্রামে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে মক্কায় যাইতে উদ্যত কোন জাহাজ প্রাপ্ত হইল না, এবং বিপরীত বায়ু প্রযুক্ত কোন জাহাজ সমুদ্রে গমন করিতে পারিল না। অতএব আগতপ্রায় শত্রুগণের হস্তহইতে রক্ষা পাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি আরাকান দেশে আশ্রয় লইতে স্থির করিলেন, এবং তদ্দেশীয় রাজার নিকটে আপন আগমনের সম্বাদ দিতে অগ্রে এক দূতকে পাঠাইলে রাজা তাঁহার সহিত প্রণয়ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলেন। পরে তিনি সপরিবারে তদ্দেশে উপস্থিত হইলে আরাকানীয় লোকেরা প্রথমে বিস্তর প্রণয় দেখাইয়া আতিথ্যব্যবহার পূর্ব্বক তাঁহাকে আরাকান নগরে সচ্ছন্দে বাস করিতে দিল। অল্প কাল গত হইলে রাজা তাঁহার প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং শেষে আপনার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে

আজ্ঞা করিলেন। শাহ সুজা এই আজ্ঞাতে কোপান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, আমি তৈমুরের কুলের অপমান করিতে নাস্তিকের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেওনে কখনো সম্মত হইব না। অনন্তর রাজা ঐ দুর্ভাগ্য রাজকুমারকে আক্রমণ করিতে সৈন্যগণকে পাঠাইলে তিনি পুরুষত্ব দেখাইয়া প্রাণপণ পূর্ব্বক শত্রুনিবারণ করিতে যত্ন করিলেন। শেষে তাঁহার অনুচরগণের অধিকাংশ হত হইলে সুজা আপনার প্রতি পড়্যমান এক বৃহৎ পাষাণের আঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরা পড়িলেন। পরে শত্রুরা তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধন করিয়া ক্ষুদ্র নৌকাতে বসাইয়া নদীর মধ্যে লইয়া গেল। তথায় দাঁড়িরা নৌকার তলা খুলিলে সুজা নৌকার সহিত জলে মগ্ন হইলেন, দাঁড়িরা অন্য নৌকাতে আশ্রয় পাইল। পরে রাজা সুজার পিয়ারী বানু নাম্নী পরম সুন্দরী বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সেই সতী আপনার অপমান নিবারণার্থে আপন বক্ষস্থলে খড়্গাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এবং তাঁহার দুই কন্যাও আত্মঘাতিকা হইলেন, তৃতীয়া কন্যা বলেতে রাজার সহিত বিবাহিতা হইয়া শোকপীড়াতে ক্ষীণা হইয়া মরিলেন। এবং তাঁহার দুই পুত্র জলে নিমগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। এই রূপে ঐ দুর্ভাগ্য সুজার বংশ সমূলে নষ্ট হইল। যত মুসলমান লোক বঙ্গদেশের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, সেই সকলের মধ্যে ঐ সুজা প্রজাগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই দুর্ঘটনার সম্বাদ দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা কারাবদ্ধ বাদশাহ হাহাকার পূর্ব্বক কহিলেন, আঃ পিতামহের অপমানের প্রতিফল দিতে

সুজার একমাত্র পুত্রও কি ঐ পাপগ্রস্ত নাস্তিক হইতে রক্ষা পায় নাই?

মীর জুমলা এই রূপে শাহ্ সুজাকে নষ্ট করিয়া বঙ্গদেশের সুবাদার হইলেন। উক্ত যুদ্ধাদির সময়ে নিকটবর্ত্তি কতক ভূপতি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ কুচবেহার দেশের রাজা আসাম দেশের একাংশ স্বহস্তগত করিয়া আপন সৈন্যগণকে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া ঢাকায় পাঠাইয়া সেই নগরের লুটপাট করাইয়াছিলেন। অতএব ১৬৬১ শালে মীর জুমলা তাঁহাকে দমন করণার্থে সৈন্যে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তাহাতে রাজাকে পর্ব্বতের আশ্রয় লইতে হইল, এবং তাঁহার রাজধানী পরাস্ত হইয়া আলমগীর নগর এই নাম পাইল, কিন্তু তাহার সেই নাম অল্পকালমাত্র থাকিল। মীর জুমলা মুহম্মদীয় মত ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্মকে ঘৃণা করাতে আপনি স্বীয় যুদ্ধাস্ত্র কুঠারদ্বারা প্রসিদ্ধ নারায়ণের মূর্ত্তিকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া প্রাসাদের ছাতে উঠিয়া মন্দিরমধ্যে প্রার্থনা করণার্থে মুসলমান লোকদিগকে আহ্বান করিলেন। পরে যে ব্যক্তিকে কুচবেহার দেশের শাসন করিতে নিযুক্ত করিলেন, তাহাকে হিন্দুদের দেবমন্দির সকল নষ্ট করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে মসজীদ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। অন্য সকল বিষয়ে সুবাদার ন্যায়কারী ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার কোন সৈন্য প্রজাদের লুট করিলে তাহার দণ্ড দিতেন, এবং নানা প্রকারে প্রজাগণের সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন। এবং তাঁহার অনুরোধে বিষ্ণু নারায়ণ নামক রাজার পুত্র মুসলমানমতাবলম্বী হইলেন। পরে সুবাদার পর্ব্বতময় অঞ্চল বিনা সমস্ত কুচবেহার দেশ বঙ্গদেশের এক প্রদেশ করিয়া তাহার রাজকর দশ লক্ষ

টাকা হইবে এই নিয়ম করিয়া ১৭১০ অশ্বারূঢ় ও ২০০০ বন্দুকধারি সৈন্য তদ্দেশের রক্ষার্থে রাখিয়া আপনি আসাম দেশ জয় করণার্থে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সৈন্যগণের প্রতিপালন ও যুদ্ধ করণার্থে যে২ দ্রব্যেতে তাঁহার প্রয়োজন ছিল, সেই সকলেতে অনেক নৌকা বোঝাই করিয়া আপনার অগ্রে পাঠাইয়া আপনি সসৈন্যে রাঙ্গামাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া স্থলপথে যাত্রা করিলেন; এবং যাত্রা কারস্তে২ যে পথ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি আছে। এইরূপে যাত্রা করা অতি বিলম্বের কর্ম্ম ছিল, কখনো২ তাহারা এক দিনের মধ্যে এক ক্রোশও অগ্রসর হইতে না, বিশেষতঃ আসামীয় লোকেরা সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিত, এবং নৌকা সকল গুন টানিয়া অগ্রসর করা অতি ক্লেশের কর্ম্ম ছিল। কিন্তু মীর জুমলা আপনি সৈন্যের ন্যায় দুঃখ স্বীকার করিতেন, এবং মধ্যে২ সমস্ত দিন পদব্রজে গমন করিতেন, এই কারণ তাঁহার সৈন্যগণ কিছু বচসা করিত না। শেষে মোগলদের সৈন্যেরা সিমলিয়া নামক এক দুর্গ নিকটে উপস্থিত হইল, সেই দুর্গ এক পর্ব্বতের শিখরে স্থিত, এবং ২০০০০ সৈন্যদ্বারা ও যুদ্ধোপযোগি নৌকাসমূহদ্বারা সুরক্ষিত ছিল, তথাপি আসামীয়েরা রাত্রিযোগে তাহা ত্যাগ করিয়া গেল। পরে সুবাদার গড়গাঁ নামক প্রধান নগর পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাহাও অনায়াসে লইলেন, এবং তদ্দেশীয় রাজা পর্ব্বতময় দেশে পলায়ন করিলে অনেক প্রধান লোক শপথপূর্ব্বক মোগলদের অধীনতা স্বীকার করিলেন। তাহাতে মীর জুমলা বাদশাহের নিকটে পত্র লিখিয়া এই দর্পের কথা জানাইলেন, আমি চীন দেশের

পথ সুগম করিলাম, আগামি বৎসরের মধ্যে পেকিন নামক সেই দেশের যে প্রধান নগর, তাহার প্রাচীরেও মুসলমানদের জয়পতাকা স্থাপন করিব। এই পত্র পাইয়া বাদশাহ্ জেঙ্গিস খাঁর তুল্য চক্রবর্ত্তী হওনের আশাতে পুলকিত হইয়া আপন জয়যুক্ত সেনাপতিকে নূতন উপাধি প্রদানদ্বারা তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি করিলেন।

ইতিমধ্যে আসামে ভারি বিপদ ঘটিল, ফলতঃ ১৬৬২ সালের বর্ষাকালে অতিশয় বৃষ্টি প্রযুক্ত ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তি তাবৎ সমভূমি জলাশয় হইয়া উঠিল, তাহাতে অশ্বদের আহারার্থে ঘাস না হওয়াতে অশ্বারূঢ় সৈন্য নিষ্কর্ম্মণ্য হইল। আসামী রাজা সাহসপূর্ব্বক আপন আশুরস্থান অর্থাৎ পর্ব্বতহইতে আসিয়া মোগলদিগের খাদ্যদ্রব্য সকল রোধ করিলেন। অধিকন্তু তাহাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইয়া অনেককে নষ্ট করিল, তাহাতে অগ্রসর হইলে এবং প্রত্যাগমন করিলে দুই দিগে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল। এই দুরবস্থায় বর্ষাকাল অতীত হইলে ভূমি শুষ্ক হইবামাত্র তাহারা সাহসপূর্ব্বক শত্রুগণকে নিবারণ করিল। তাহাতে রাজা লোক পাঠাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, এবং মীর জুমলা আহ্লাদপূর্ব্বক তাহাতে সম্মত হইলেন, যেহেতুক তিনি আপনি রোগগ্রস্ত ছিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। আসামীয়েরা বিংশতি সহস্র তোলা স্বর্ণ ও এক লক্ষ তোলা রূপা ও চল্লিশ হস্তী দিল, তদ্ভিন্ন রাজা আপন কন্যাকে মুসলমানজাতীয় কোন রাজকুমারের সহিত বিবাহার্থে দিলেন, এবং বার্ষিক উপঢৌকনও দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু হিন্দুজাতীয় ইতিহাসরচকেরা বলে, মীর জুমলার সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হওয়াতে

তাঁহাকে কামরূপ নামক সমুদয় প্রদেশ আসামীয় লোক-দিগকে দিতে হইল।

এই সময়ে সুবাদারকর্ত্তৃক নিযুক্ত কুচবেহারের দেশাধ্যক্ষ প্রজাগণের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিলে তাহারা পুরাতন রাজার নিকটে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজত্ব লইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজা ইহাতে সম্মত হইয়া প্রথমে সভ্যতাপূর্ব্বক দেশাধ্যক্ষের নিকটে এই পরামর্শ পাঠাইয়া দিলেন, আপনি নির্ব্বিরোধে দেশ ত্যাগ করুন। কিন্তু দেশাধ্যক্ষ ইহাতে অসম্মত হইলে রাজা লোক সংগ্রহ করিয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তাহাতে তাহারা গোয়াহাটী পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিয়া মীর জুমলার আগমনের অপেক্ষাতে তথায় রহিল। মীর জুমলা গড়গাঁহইতে সেই স্থানে আইলে তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে পীড়া এমত প্রবল ছিল, যে দশ ২ জনের মধ্যে এক ২ জনও প্রায় কর্ম্মের যোগ্য ছিল না, তথাপি তিনি সকলের মধ্যে বলবান সৈন্যগণকে বাছিয়া অধ্যক্ষদের সহিত কুচবেহার দেশে পাঠাইলেন। পরে তিনি অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত ঢাকায় প্রত্যাগমন করিলে তথায় তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

মীর জুমলা মহাত্মা ও গুণবান লোক ছিলেন, এবং তাঁহার সৌভাগ্য তাঁহার নিজ চেষ্টার ফল ছিল। তিনি প্রায় ন্যায়রূপে দেশের শাসন করিতেন, এবং প্রজাগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। যে ইউরপীয় লোকদের সহিত মধ্যে২ তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার মরণে খেদযুক্ত হইলেন; এবং যে বাদশাহ তাঁহার সাহায্যদ্বারা রাজত্ব পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মৃত্যুর সম্বাদে শোকসাগরে মগ্ন হইলেন।

৬ অধ্যায়।

মীর জুমলার মরণানন্তর আওরঙ্গজেব শাইস্ত খাঁকে বঙ্গদেশের সুবাদার করিলেন। সেই শাইস্ত খাঁ ১৬৬৩ শালাবধি ১৬৮৯ শাল পর্য্যন্ত দেশের শাসন করিলেন, তথাপি সেই সাতাইশ বৎসরের মধ্যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং দেশের শাসন করিলেন না, অন্য দুই জন সুবাদার তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজকর্ম্ম চালাইলেন। ঐ সময়ের ঘটনা বিশেষ মনোযোগের যোগ্য, যেহেতুক তৎকালে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয় বণিকদের সহিত মোগলজাতীয় দেশাধিকারিদের নানা প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ শাইস্ত খাঁ প্রসিদ্ধ নূর জাহানের ভাগিনেয় ছিলেন, এবং এইক্ষণে কলিকাতা নগর যে স্থানে আছে, সেই স্থানে ইংরাজ বণিকেরা প্রথমে তাঁহার অধিকারের শেষ সময়ে আবাস করিয়াছিল।

যে সময়ে শাইস্ত খাঁ সুবাদারের পদে নিযুক্ত হন, প্রায় সেই সময়ে অর্থাৎ ১৬৬৩ শালের আরম্ভকালে ইষ্ট ইন্দিয়া কোম্পানির আজ্ঞানুসারে বঙ্গদেশে স্থিত কারখানা সকল মান্দ্রাজের বশীভূত হইয়াছিল, এবং বালেশ্বর ও কাশিমবাজার এই দুই স্থানে দুই ছোট কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। কাশিমবাজারের প্রথম কারখানা ১৬৬৩ শালে স্থাপিত হইলে মারশাল নামক এক সাহেব তাহার অধ্যক্ষ হইলেন। তিনি এ দেশীয় ভাষা অধ্যয়ন করিতেন, বিশেষতঃ ১৬৭৪ শালে শ্রীভাগবৎ পুরাণের একাংশ সংস্কৃত ভাষাহইতে ভাষান্তর করিলেন। বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে কোন ইংরাজ লোক সেই প্রসিদ্ধ ভাষা শিখেন নাই।

শাইস্ত খাঁ প্রথমে আরাকান দেশের বিষয়ে ব্যস্ত হইলেন, যেহেতুক সুলতান সুজার হত্যাদ্বারা মোগল লোকেরা ক্রুদ্ধ কিম্বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই ইহা দেখিয়া, এবং আসাম দেশে মীর জুমলা আপদ্গ্রস্ত হইয়াছে ইহা শুনিয়া, আরাকানীয় রাজা দুঃসাহসী হইয়া যত নিষ্কর্ম্মা ইউরপীয় লোককে পাইলেন, সেই সকলকে বেতন দিয়া তাহাদের সাহায্যে পদ্মা নদীর মুহানাতে স্থিত উপদ্বীপ সকল হস্তগত করিয়া ঢাকা নগরের প্রাচীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ লুটপাট করিলেন, তাহাতে সেই নগরনিবাসিরা মগ লোকদের নাম শুনিবামাত্র কম্পবান হইত। তৎকালে বেণিয়ে সাহেব নামক ভারতবর্ষপ্রবাসি এক জন ইউরপীয় লোক আরাকান দেশের এবং চট্টগ্রাম প্রদেশের অবস্থা এই কথাদ্বারা বর্ণন করিয়াছিলেন, যথা, ইউরপীয় লোকদের মধ্যে অধম যত পর্ত্তুগীষ লোক গোয়া, কচিন, মালাকা প্রভৃতি স্থানহইতে পলাইয়া নিষ্কর্ম্ম দেশভ্রমণ করিতেছিল, সেই সকলে আরাকান দেশে আশ্রয় লইত, এবং আরাকানীয় রাজা মোগল লোকদের হইতে রক্ষা পাওনের নিমিত্তে তাহাদিগকে আপন রক্ষক-সৈন্য করিয়া বেতন দিতেন, এবং চট্টগ্রাম প্রদেশে তাহাদিগকে ভূমি প্রদান করিয়া বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিতে ও সর্ব্বত্র লুটপাট করিতে অনুমতি করিতেন। তাহাতে তাহারা নাবিক চোর হইয়া সমুদ্রগামি জাহাজও আক্রমণ করিত, এবং নদনদীদিয়া ত্রিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত দেশের মধ্যস্থানেও গমন করিয়া গ্রাম সকল লুট করিয়া দগ্ধ করিত, এবং তথাকার মনুষ্যদিগকে ধরিয়া ক্রীত দাসের ন্যায় ব্যবহার করিত। পরে বৃদ্ধদিগের মুক্তির জন্যে টাকা পাইলে তাহাদিগকে মুক্ত করিত, কিন্তু যুবা সকলকে

জাহাজে লইয়া দাঁড়ী করিত, এবং বাপ্তাইজ করাইয়া আপনাদের তুল্য মিথ্যা খ্রীষ্টীয়ান করিত, এবং দিনেমার সাহেবেরা দশ বৎসরের মধ্যে যত লোক খ্রীষ্টীয়ান করে, আমরা এক বৎসরের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক লোক খ্রীষ্টীয়ান করি এমন দর্প করিত।

শাইস্ত খাঁ বুদ্ধিমান এবং গুণের প্রগল্ভতাবিশিষ্ট হওয়াতে অবিলম্বে নৌকাসমূহ প্রস্তুত করিয়া ৪৩০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরাকানীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে উপদ্বীপ সকল ত্যাগ করাইলেন, বিশেষতঃ তাহারা যে সন্দীপ বীরত্বপূর্ব্বক রক্ষা করিতে যত্ন করিল, তাহাও অবশেষে লইলেন। পরে চট্টগ্রামের রক্ষক পর্ত্তুগীয় লোকদিগকে আরাকানীয়দের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মোগলদিগের বশীভূত হইতে পরামর্শ দিয়া কহিলেন, যদি তোমরা অসম্মত হও, তবে আমি তরবল হইতে তোমাদিগকে লোপ করিব। তাহাতে তাহাদের জাতীয় লোকেরা পূর্ব্বে হুগলিতে যে বিষম আপদে পড়িয়াছিল তাহা স্মরণে আইলে তাহারা সুবাদারের পরামর্শ গ্রাহ্য করিল। পরে বলবান লোক সকল তাঁহার সৈন্য হইল, অবশিষ্টেরা বালক ও বনিতা সহিত ঢাকার দক্ষিণে দশ ক্রোশ দূরে স্থিত ফিরিঙ্গী বাজার নামক স্থানে বসতিপ্রাপ্ত হইল। সেই স্থান অদ্যাপি আছে।

পরে শাইস্ত খাঁ ভূমিচর সৈন্য লইয়া যে ফেনী নদী পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশের সীমা ছিল, তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে আরাকানীয় লোকেরা ব্যূহ রচনা করিয়াছিল, কিন্তু মোগলদের বহুসংখ্যক অশ্বারূঢ় সৈন্য দেখিয়া পলাইয়া গেল। ইতিমধ্যে সুবাদারের নৌকারূঢ় সৈন্য আরাকানীয়দের তিন শত নৌকা আক্রমণ

করিয়া জয়যুক্ত হইলে চট্টগ্রাম একেবারে বেষ্টিত হইল। সেই নগর প্রাচীরাদিদ্বারা সুদৃঢ় ছিল বটে, কিন্তু তাহার রক্ষাকারিরা জাহাজ সকলকে ছিন্নভিন্ন দেখিয়া নৈরাশ্য প্রযুক্ত নগর ত্যাগ করিল। তাহাতে মোগল জাতিরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া দুই সহস্র লোককে ধরিয়া দাসত্বে রাখিল। দুর্গের মধ্যে ছোট বড় সর্ব্বশুদ্ধ বারো শত কামান পাওয়া গেল, এমন জনশ্রুতি আছে, কিন্তু মোগলেরা যে গুপ্ত ধনপ্রাপ্তির অপেক্ষাতে ছিল, তাহা পাওয়া গেল না। এই রূপে ১৬৬৬ শালে চট্টগ্রাম নগর ও তাহার অধীন প্রদেশ আরাকানীয় রাজ্যশ্রেণী হইতে অপহৃত হইয়া বঙ্গদেশের একাংশ হইয়া উঠিল।

শাইস্তা খাঁ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত উত্তমরূপে দেশের শাসন করিয়া ১৬৭৭ শালে আগরার দেশযাত্রী হইলেন। তাঁহার অধিকারসময়ে বঙ্গদেশে ইউরোপীয় লোকদের বাণিজ্য অতিশয় বাড়িয়াছিল। তিনি ইউরোপীয় লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করেন না, এই যে অপবাদ তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, তাহা নিরর্থকমাত্র বোধ হয়। পূর্ব্বে মোগল জাতীয় শাসনকর্ত্তারা নানা সন্দেহ প্রযুক্ত ইংরাজদের জাহাজ হুগলি নগরের নিকটে যাইতে নিষেধ করাতে তাহাদিগকে নদীর মুহানার নিকটে লঙ্গর ফেলিয়া বাণিজ্যদ্রব্য সকল ক্ষুদ্র নৌকাতে আনয়ন ও প্রেরণ করিতে হইত। ইহাতে তাঁহাদের বিস্তর ক্লেশ ও ক্ষতি জন্মিলে তাঁহারা শাইস্তা খাঁর নিকটে আপনাদের জাহাজ কারখানার সম্মুখ পর্য্যন্তই আনিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তিনি অনুমতি দিলে কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্স ১৬৬৮ শালে এক দল নাবিক পথদর্শক বেতন দিয়া রাখিতে

আজ্ঞা করিলেন। যে সকল পাইলট্ (অর্থাৎ নাবিক-পথদর্শক) সাহেবেরা এই বর্ত্তমান কালে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের সেই কর্ম্মের ঐ মূল ছিল। ১৬৬৪ সালে কলবের সাহেব অনেক অতি নিপুণ নাবিক-ব্যক্তির পরামর্শানুসারে ফরাসি লোকেরাও এক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করিলে ১৬৭৪ সালে তাঁহাদের কতক জাহাজ ভাগিরথী নদীতে উপস্থিত হইল, এবং প্রায় ঐ কালে চন্দননগরে তাঁহাদের আবাস স্থাপিত হইল। যে ওলন্দাজ লোকেরা পূর্ব্বে কেবল বালেশ্বরে বাণিজ্য করিতেন, তাঁহারাও ১৬৫২ সালে হুগলিতে কারখানা স্থাপনের অনুমতি পাইলেন, এবং অনুমান হয় সেই কারখানা নদীতে বিনষ্ট হওয়াতে হুগলিহইতে এক ক্রোশ দূরে স্থিত চুঁচুড়া গ্রাম তাঁহাদিগকে দেওয়া গেল। ১৬৭৬ সালে দানিমার লোকেরাও বঙ্গদেশে আসিয়া বাণিজ্য করণের অনুমতি পাইয়া আপনাদের প্রধান কারখানা বালেশ্বরে স্থাপন করিলেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহাদের হুগলিতে বাণিজ্য করণে কোন বাধা ছিল না। এইরূপে শাইস্ত খাঁর অধিকারসময়ে ইউরপীয়দের বাণিজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শাইস্ত খাঁ যেমন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হওনের সময়ে ইউরপীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্থানান্তরে গমন করিয়াও তাহাদের মঙ্গলের চেষ্টা করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। পূর্ব্বে যত বার নূতন সুবা-দার আসিত, তত বার ইংরাজদিগকে নূতন আজ্ঞাপত্র লইতে হইত, এবং মোগল জাতীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ সকলকে ভারি পারিতোষিক না দিলে তাহা হইত না, এই কারণ ঐ নিয়ম অতি কঠিন বোধ হইল। শাইস্ত খাঁ যখন বঙ্গ-

দেশহইতে প্রস্থান করিলেন, তখন ইংরাজদের কার্য্যখানার প্রধান কর্ত্তা তাঁহার সহিত এক জন দূতকে বাদশাহের নিকটে প্রেরণ করিয়া স্বজাতীয়দের বাণিজ্য বিষয়ে এক চিরস্থায়ি রাজাজ্ঞাপত্র প্রার্থনা করিলেন, এবং অধিক ক্লেশে শাইস্তু খাঁর সাহায্যদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ আজ্ঞাপত্রের প্রাপ্তিতে ইংরাজেরা এত আনন্দিত হইলেন, যে তাহা আনীত হইলে তিন শত সেলামি তোপ ছুড়িলেন।

১৬৭৮ শালে আওরঙ্গজেব আপন তৃতীয় পুত্র মহম্মদ আজীমকে বঙ্গদেশের সুবাদার করিলেন। সেই সময়ে আসামীয়েরা দেশের পূর্বসীমাস্থিত অঞ্চল পুনরায় আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহাতে নূতন সুবাদার তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে স্থির করিয়া ইংরাজ ও ওলন্দাজ লোকদের নিকটে গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সৈন্যদের পরিবর্তে অনেক অর্থদান করিতে স্বীকার করিলে তিনি সেই অর্থ গ্রহণ করিলেন। সুবাদার আসাম দেশে প্রবেশ করিলে আসামীয়েরা তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া গেল, তাহাতে তিনি সেই দেশ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত জ্ঞান করিয়া পিতার নিকটে আরাকানীয়দের সহিত যুদ্ধ করণের অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু তৎকালে নূতন যুদ্ধের উপক্রম করিতে আওরঙ্গজেবের অবকাশ ছিল না, যেহেতুক তাঁহার হিন্দুজাতীয় প্রজা সকল তাঁহাকর্ত্তৃক অতিশয় উপদ্রুত হওয়াতে রাজপুতানা দেশের প্রধানেরা এবং মাহারাট্টাদিগের শিবজী নামক প্রধান লোক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব তিনি আপন পুত্রকে অবিলম্বে আপনার নিকটে আসিতে আজ্ঞা করি-

লেন, তাহাতে মুহম্মদ আজীম ঢাকাহইতে পঁচিশ দিনের মধ্যে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে এমন শীঘ্রগমন অতি আশ্চর্য্য বোধ হইল।

১৬৭৯ শালে শাইস্তা খাঁ পুনর্বার বঙ্গদেশের সুবাদার হইলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে হিন্দু লোকদের উপরে উপদ্রব করণের আজ্ঞা দেওয়াতে তিনি স্বয়ং দয়ালু হইয়া তৎপ্রযুক্ত আজ্ঞাবহ হইয়া দেশে আগমন করিবামাত্র হিন্দুধর্মাবলম্বিদের মধ্যে প্রত্যেক জনের নিকটে কর আদায় করিতে লাগিলেন। এবং হুগলিতে তাঁহার ভৃত্যেরা ইঙ্গরাজদের নিকটেও সেই কর চাহিল, কিন্তু কোম্পানির ইঙ্গরাজ লোকেরা তাহা দিতে অস্বীকার করিয়া কতিপয় তাতার অশ্বের উপঢৌকনদ্বারা নবাবকে সন্তুষ্ট করিলেন, তৎকালে হিন্দুদের অনেক মন্দির নষ্ট হইল, এবং শ্রীযুক্ত মল্লীকচন্দ্র রায় নামক এক জন অতি মান্য হিন্দু লোক যেন অধিক অর্থ ত্যাগ করেন, এই জন্যে বেড়িতে বদ্ধ হইলেন। এইরূপ উপদ্রব হইলে আওরঙ্গজেবের এবং তাঁহার নিযুক্ত সুবাদারের কর্তৃত্ব অতি দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল।

তৎকালে বঙ্গদেশে কোম্পানির বাণিজ্য অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে এবং বাদশাহের আজ্ঞাপত্রদ্বারা বাণিজ্য করণের চিরস্থায়ি অনুমতি হওয়াতে কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স বঙ্গদেশের কর্ম্ম মান্দ্রাজের অনধীন করিতে স্থির করিয়া ১৬৮১ শালে বঙ্গদেশের কারখানা সকল স্বতন্ত্র করিলেন, এবং হেজেস নামক সাহেবকে তাহার প্রথম কর্ত্তা করিয়া তাঁহার সেবার্থে বিংশতি জন ইউরপীয় সৈন্য ও এক জন কর্পরাল (অর্থাৎ ছোট নায়ককে) সঙ্গে পাঠাইলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজেরা এখন যে দুই লক্ষ

লোক পরিমিত সৈন্যসমূহ রাখেন, তাহার মূল ঐ ক্ষুদ্র সৈন্যদল ছিল। তদবধি আজ্ঞা লইবার নিমিত্তে মান্দ্রাজে যাইতে অনাবশ্যক হইলে বঙ্গদেশগামি জাহাজ সকল একেবারে ভাগীরথী নদীতে যাইতে লাগিল, এবং যে কএকটি জাহাজ প্রথমে তথায় গেল, তাহাদের একের উপরে ত্রিশ কামান ছিল।

এই সময়ে কোম্পানির অনধীন অনেক লোকের অনধিকারচর্চা পূর্ব্বক গুপ্তরূপে বাণিজ্য করণে কোম্পানি অতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, যেহেতুক ইংলণ্ডীয় রাজা কর্তৃক যে চার্টর (অর্থাৎ রাজাজ্ঞাপত্র) কোম্পানিকে দত্ত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা কোম্পানির অনুমতি বিনা অন্য সকল লোককে ভারতবর্ষাদি দেশে বাণিজ্য করিতে নিষেধ করা গিয়াছিল, কিন্তু সেই বাণিজ্য লাভজনক হওনাতে অনেক বণিক ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোম্পানিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহাদিগের নিবারণার্থে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নানা মতে মিথ্যাশ্রম করিলে পরে কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্স বুঝিলেন তাঁহাদের নদীতে প্রবেশ করণ নিবারিত না হইলে বঙ্গদেশে তাঁহাদের বাণিজ্য নিবারিত হইতে পারে না। অতএব ডাইরেক্টর সাহেবদের আদেশানুসারে হুগলির কারখানার কর্ত্তা নদীর মুহানাতে এক দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু এইরূপ দুর্গ নির্ম্মিত হইলে নদীর সমস্ত বাণিজ্যাদি ইংরাজদের আয়ত্ত হইবে, ইহা বুঝিয়া শাইস্তা খাঁ সেই প্রার্থনাতে অস্বীকৃত হইলেন। অধিকন্তু সেই সময়ে বেহার দেশে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইলে কোম্পানির কর্ম্মে নিযুক্ত যে ব্যক্তি পাটনায় বাস করিতেছিলেন, তিনি সেই গোলযোগে হাত দিয়া থাকি-

বেন, এমন সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তাহাতে ক্রমে২ ইং-রাজদের প্রতি নবাবের চিত্তবিকার হইলে তিনি বাদ-শাহ কর্তৃক উল্লেখিত তিন সহস্র টাকা নির্দিষ্ট বাৎসরিক রাজকরের পরিবর্তে তাঁহাদের নিকটে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্যের শতাংশের সাড়ে তিন অংশ আদায় করি-তে আজ্ঞা করিলেন। নবাবের অসন্তোষ প্রকাশ পাইলে তাঁহার ভৃত্যগণও ইংরাজদিগকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা পাইল। বিশেষতঃ যে তন্তুবায়িদের নিকটে কোম্পানির দেড় লক্ষ টাকা পাওনা ছিল, তাহাদের সেই ঋণ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে তেতাল্লিশ সহস্র টাকা দান করিতে হইবে কাশীমবাজারের ফৌজদার অকারণে কোম্পানির কর্মাধ্যক্ষ জোব চার্ণক সাহেবের এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা করিলেন। চার্ণক সাহেব ঐ মুদ্রা পরিশোধ করিতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু নবাবের নিকটে বার২ নিবেদন করিলেও এবং তাঁহার ভৃত্যগণকে উৎকোচ দিলেও কিছু ফল লব্ধ হইল না। নবাব বাদশাহের নিকটে ঐ ঘটনার যে বৃত্তান্ত জানা-ইলেন, তাহাদ্বারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে বাদশাহের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। তাহাতে তাঁহাদের বাণিজ্যাদি সকল কর্ম বিশৃঙ্খল হইলে তাঁহাদের জাহাজ সকল অর্দ্ধশূন্য হইয়া ইউরপে প্রত্যাগমন করিত। ওলন্দাজ লোকেরা ইংরাজদের এইরূপ বিবাদের সময় আপনাদের সুযোগ বুঝিয়া আপন বাণিজ্যের বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইলেন, এবং সেই সময়ে চুঁচড়াস্থিত আপন আবাস প্রাচীরাদি-দ্বারা বেষ্টন করিতে উপক্রম করিয়া চারি বুরুজদ্বারা তাহা এমন সুদৃঢ় করিলেন, যে যুদ্ধের সময়ে দেশীয় সৈন্য-গণকে নিবারণ করিতে তাঁহাদের সুসাধ্য হইল। সেই ফর্ট গুষ্টাবস নামক দুর্গনির্ম্মাণ ১৬৮৭ শালে সাঙ্গ হইল।

তৎকালে ওলন্দাজ লোকেরা সেই স্থানে আপন রাজকর্ম্ম প্রভৃতির নিয়ম সুন্দররূপে স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ লোকেরা দেশে থাকিতে পারিবেন কি না, ইহাও নিশ্চয় জানিলেন না। চুঁচুড়ার অধীন ওলন্দাজদের বরাহ-নগরে ও ফলতাতে অন্য দুই কারখানা ছিল, এবং তাঁহাদের জাহাজ প্রায় ফলতাতে লঙ্গর ফেলিয়া থাকিত।

অপর বাণিজ্য রক্ষার্থে যুদ্ধ না করিলে আমাদিগকে বাণিজ্য ত্যাগ করিতে হইবে, ইংরাজেরা ইহা বুঝিয়া যুদ্ধ মনোনীত করিয়া দ্বিতীয় জেমস নামক তাৎকালিক ইংলণ্ডীয় রাজার নিকটে যুদ্ধ করণের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি বঙ্গদেশের নবাবের এবং তাঁহার প্রভু আওরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন। অতএব ছয়শত সৈন্য সম্বলিত দশখান যুদ্ধজাহাজ আইল, তাহার কর্ত্তা আদমিরল নিকলসন সাহেব ছিলেন। কোম্পানির সকল ভৃত্য ও সমুদি জাহাজ সঙ্গে লইয়া চট্টগ্রাম নগর আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিতে এবং যে দুই শত কামান তাঁহার জাহাজে আনীত হইয়াছিল, তাহা ঐ নগরের রক্ষার্থে তথায় স্থাপন করিতে এবং মোগলদের চিরস্থায়ি শত্রু আরাকানীয় রাজার সহিত সন্ধি করিতে ও হিন্দুজাতীয় জমীদার সকলকে আশ্বাস করিতে ও রাজকর গ্রহণ করিতে এবং এক টাকশালা স্থাপন করিতে, এই ২ প্রকার যে আজ্ঞা তাঁহাকে দত্ত হইয়াছিল, তদনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যদি তাঁহার সাধ্য হইত, তবে তিনি এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিতেন। কিন্তু এই সকল বাসনা বিপরীত হইল, যেহেতুক ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব ইংরাজদের হস্তগত হওনের সময় তৎকালে উপস্থিত হয় নাই। তাঁহাদের সকল

কল্পনা নানাবিধ ঘটনাদ্বারা নির্মূল হইল। ফলতঃ তাঁহাদের জাহাজসমূহ ঝড়দ্বারা সমুদ্রে ছিন্নভিন্ন হওয়াতে কতক জাহাজ বিপরীত বায়ুপ্রযুক্ত নিয়মিত সময়ে আসিতে পারিল না, কিন্তু অন্যান্য জাহাজ ভাগীরথী পাইয়া হুগলিতে উপস্থিত হইল, এবং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মান্দ্রাজের দেশাধ্যক্ষ চারি শত সৈন্যকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। এই রূপে জলে এবং স্থলে যুদ্ধ করিতে ইংরাজদের প্রবৃত্তি দেখিয়া নবাব ভীত হইয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টান্বিত হওয়াতে কোন মধ্যস্থের বিচারদ্বারা বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু ইংরাজেরা যষ্টি লক্ষ টাকা চাহিলে সেই বিচার করণে বিলম্ব হইয়া, তাহাতে হঠাৎ কোন দৈবঘটনাদ্বারা ইংরাজদের সকল আশা নষ্ট হইল।

১৬৮৬ শালের ২৮ আকটোবর তিন জন ইংরাজি পদাতিক হুগলির বাজারে নবাবের কতিপয় সৈন্যদের সহিত বিবাদ করিয়া অতিশয় প্রহারিত হইলে তাঁহাদের সাহায্য করণার্থে প্রথমে এক দল, পরে অন্য দল সৈন্য, শেষে ইংরাজদের যত সৈন্য ছিল সেই সকলে প্রেরিত হইল। তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে নবাবের সৈন্যগণ আহূত হইয়া নগরের বাহিরে স্থিত আপন শিবিরহইতে নগরমধ্যে আইলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল, বিশেষতঃ মোগল সৈন্যদের মধ্যে ষষ্টি জন হত এবং অনেকে ক্ষতবিক্ষত হইল। এই যুদ্ধের সময়ে নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ নিকলসন সাহেব আপন ২ জাহাজের কামান ছুঁড়িতে আজ্ঞা দিলে নগরের পাঁচ শত গৃহ নষ্ট হইল। বিশেষতঃ যাহার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য সঞ্চিত ছিল, কোম্পানির এমন এক গুদামও নষ্ট হইল। এই সকল ঘটনায় ফৌজদার

ত্রাসযুক্ত হইয়া যুদ্ধের নিবৃত্তি প্রার্থনা করিলেন, এবং ইংরাজেরা তাহাতে সম্মত হওয়াতে ফৌজদার তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে তাঁহাদের জাহাজে মোরা দেওনে তাঁহাদের সাহায্য করিলেন, কেবল তাহা নহে, বরং যদবধি বাদশাহের এতদ্বিষয়ক আজ্ঞা প্রকাশিত না হইবে, তদবধি তাঁহারা পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিতে পারিবেন ইহাতেও স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নবাব ঐ সকল ঘটনার সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহাদের যত কারখানা পাটনা ও মালদা ও ঢাকা ও কাসিমবাজার এই সকল স্থানে ছিল, সেই সকল রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং ইংরাজ লোকদিগকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করণার্থে পদাতিক ও অশ্বারূঢ় সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিলেন।

হুগলি নিবাসি ইংরাজ কম্মাধ্যক্ষ প্রাণশঙ্কাপ্রযুক্ত ২০ ডিসেম্বর কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন, অর্থাৎ বরাহনগরে স্থিত ওলন্দাজ লোকদের কারখানার দক্ষিণে দুই ক্রোশ দূরে যে সূতানুটী গ্রাম ছিল, তাহাতে আশ্রয় লইলেন। সেই গ্রাম ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়া কলিকাতা নগর হইয়া উঠিল। তিনি যে মাসে পলায়ন করিলেন, সেই মাসের মধ্যে নবাবের তিন জন মন্ত্রী হুগলিতে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে চার্ণক সাহেব তাঁহাদের সহিত সন্ধির নিয়ম করণার্থে তথায় গেলে ইংরাজেরা পূর্ব্ববৎ বাণিজ্যাদির কর্ম্ম করিতে পারিবেন, এই নিয়ম স্থির করা গেল। এইরূপ সন্ধিদ্বারা তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের কোম্পানিকে একেবারে নষ্ট করণের সুযোগ পাইতে নবাবের অভিপ্রায় ছিল। ১৬৮৭ শালের ফিব্রুয়ারি মাসের আরম্ভ সময়ে ইংরাজ লোকদিগকে দেশহইতে তাড়াইয়া দিতে অনেক

সৈন্য হুগলিতে উপস্থিত হইল, তাহাতে চার্ণক সাহেব সূতানুটীতে থাকিতে ভীত হইয়া আপনার যত লোক ও সামগ্রী ছিল, সেই সকল জাহাজে লইয়া জলপথে ইঙ্গিলীতে গমন করিলেন, এবং গমনকালে তানার দুর্গ ভগ্ন করিয়া মোগলদের কতক জাহাজ ধরিলেন।

ইঙ্গিলী নামে যে উপদ্বীপ তৎকালে ইংরাজদের আশ্রয় হইল, তদপেক্ষা কুৎসিত স্থান পাওয়া দুষ্কর, যেহেতুক তাহা নদীর মুহানাতে স্থিত নিষ্টজলরহিত নলবনমাত্র ছিল। তাহাতে চার্ণক সাহেব সেই স্থানে শিবির করিয়া খাত খনন পূর্ব্বক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে তিন মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক সৈন্য পঞ্চত্ব পাইল। মোগল লোক তাঁহার পশ্চাতে গমন করিলেন, কিন্তু যত বার সেই স্থানকে আক্রমণ করিলেন, তত বার পরাভূত হইলেন। শেষে দুর্ভাগ্যরূপ ঘোর অন্ধকারে মগ্ন ইংরাজেরা পুনরায় সৌভাগ্যরূপ অরুণোদয় দেখিতে পাইলেন। ফলতঃ যে সময়ে তাঁহাদের বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করণ বিনা অন্য কোন উপায় ছিল না, সেই সময়ে শুবাদার সন্ধি স্থির করণার্থে এক দূত প্রেরণ করিলেন। চার্ণক সাহেব আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলে ১৬৮৭ শালের ১৬ আগষ্ট সন্ধির নিয়ম স্থির হইল। সেই নিয়মদ্বারা ইংরাজ লোক দেশের নানা স্থানে কারখানা করণের অনুমতি পাইলেন, এবং তাঁহারা পূর্ব্বে এক ২ টাকার মধ্যে সওয়া দুই পয়সা করিয়া যে রাজকর দিতেন, তাহা আর দিতে হইল না, এবং বাণিজ্যদ্রব্য ভাণ্ডারে সঞ্চয় করণের ও জাহাজ সারাওনের নিমিত্তে উলুবেড়ে গ্রাম তাঁহাদিগকে দত্ত হইল, কিন্তু চার্ণক সাহেব যে মোগল জাহাজ সকল লইয়াছিলেন, তাহা ফিরিয়া দিতে হইল।

ইংরাজেরা অকস্মাৎ এই রূপ অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছিলেন, তাহার কারণ এই। বঙ্গদেশে যে বিবাদ হইয়াছিল তাহার সম্বাদ পাইবামাত্র কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স বলেতে কার্য্য করিতে স্থির করিয়া সৌরাষ্ট্রে স্থিত আপন কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে পত্র পাঠাইয়া তথাকার কারখানা রুদ্ধ করিয়া সামুদ্রিক যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তৎকালে যত মুসলমান লোক স্বীয় ধর্ম্মমতানুসারে মক্কাতে তীর্থযাত্রা করিত, তাহারা সকলে ঐ সৌরাষ্ট্র নগরে জাহাজ আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিত, এবং মোগলদের যত যুদ্ধজাহাজ ছিল, সেই সকলের ঐ যাত্রিদের রক্ষা করণ বিনা অন্য কোন কর্ম্ম প্রায় ছিল না; তাহাতে সৌরাষ্ট্রে কোম্পানির কারখানা রুদ্ধ হইলে মোগলদের যে কোন জাহাজ ভারতবর্ষের তীরে আইসে কিম্বা তাহা ত্যাগ করে, সেই জাহাজ ইংরাজদের হস্তগত হয়। এই রূপে ইংরাজদের জাহাজদ্বারা সৌরাষ্ট্র অবরুদ্ধ এবং সমুদ্র ব্যাপ্ত হওয়াতে মক্কার পথ বদ্ধ হইল, অতএব ইংরাজদের সহিত যাবৎ সন্ধি না হয়, তাবৎ তীর্থযাত্রা করা আমার প্রজাগণের অসাধ্য হইবে, ইহা বুঝিয়া আত্মাভিমানী আওরঙ্গজেব ঐ সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সন্ধি নিষ্পন্ন হইলে চার্ণক সাহেব হিজ্‌লী ত্যাগ করিয়া প্রথমে উলুবেড়েতে, পরে সূতানুটীতে গমন করিলেন।

অল্প কাল গত হইলে নবাব পূর্ব্ববৎ অন্যায় করিতে লাগিলেন। ফলতঃ ইংরাজদিগকে হুগলিতে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং সূতানুটীতে প্রস্তরময় কিম্বা ইষ্টকাময় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিলেন, এবং আপন সৈন্যদিগকে তাঁহাদের দ্রব্য লুট করণের অনুমতি দিলেন, এবং আপনি চার্ণক সাহেবের নিকটে অধিক

মুদ্রা চাহিলেন। তৎকালে চার্ণক সাহেব টাকার অভাব প্রযুক্ত নবাবের দুর্নি জন্মাইতে না পারাতে এবং অস্ত্রাদির অভাব প্রযুক্ত তাঁহার অন্যায় নিবারণে অক্ষম হওয়াতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শান্ত করণার্থে এবং সূতানুটীতে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করণার্থে আপনার দুই জন মন্ত্রিকে ঢাকায় তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা অতি কষ্টে তাঁহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবামাত্র নূতন বিপদসম্ভাবনার ভয় জন্মিল।

হুগলির যুদ্ধ এবং সৈন্যগণের হিজ্লিতে পলায়ন বিষয়ক সমাচার কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স নামক সভার নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা যদি পারেন তবে দুর্গ নির্ম্মাণ ও টাঁকশালা স্থাপন করিবেন, নতুবা বঙ্গদেশে বাণিজ্য আর করিবেন না, ইহা স্থির করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৈন্য পাঠাইলেন। ফলতঃ যাহার মধ্যে চৌসট্টি কামান ছিল, এমন এক বড় জাহাজ এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র অন্য এক জাহাজ পাঠাইলেন, এবং সেই দুই জাহাজের কর্ত্তা কাপ্তান হীথ সাহেবকে প্রথমে কোন মতে আপনাদের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করণের চেষ্টা করিতে, পরে যদি তাহা তাঁহার অসাধ্য হয়, তবে আপনাদের সমুদয় ভৃত্য লইয়া মান্দ্রাজে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সেই কাপ্তান হীথ সাহেব স্বেচ্ছানুযায়ী লোক হওয়াতে কাহারো পরামর্শ না শুনিয়া কেবল আপনার অভিলাষানুসারে কর্ম্ম করিতেন। তিনি ১৬৮৮ শালের আক্টোবর মাসে বঙ্গদেশে পঁহুছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কোম্পানির সকল ভৃত্যকে কোম্পানির সম্পত্তির সহিত আপনার জাহাজ আরোহণ করাইয়া ৮ নবেম্বর জলপথে বালেশ্বরে গমন করিলেন। তাঁহার অতিত্বরা নিবারণার্থে চার্ণক সাহেব যে সকল

চেষ্টা করিলেন, সেই সকল বৃথা হইল। জাহাজ বালেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইলে তথাকার শাসনকর্ত্তা সেই নগরনিবাসি কোম্পানির দুই জন কর্ম্মাধ্যক্ষকে ধরিয়া প্রতিভূরূপে আটক করিয়া রাখিলেন। সেই দুই কর্ম্মাধ্যক্ষ কারাবদ্ধ হইলেও, এবং চার্ণক সাহেব পূর্ব্বে যাহাদিগকে দূতরূপে ঢাকায় পাঠাইয়াছিলেন, সেই দুই জন মন্ত্রী তথায় নবাবের হস্তগত হইলেও হীথ সাহেব ২৯ নবেম্বর আপন সৈন্যগণকে জাহাজহইতে নামাইয়া বালেশ্বর নগরকে আক্রমণ পূর্ব্বক লুটপাট করিলেন। সেই দিনে তথাকার শাসনকর্ত্তার নিকটে এক পত্র আইল তাহার মধ্যে ঢাকাতে ঐ দুই ইংরাজী দূত কর্ত্তৃক নবাবের সহিত নির্দ্ধারিত সন্ধির অনুলিপি ছিল। সেই সন্ধি অনুসারে আরাকান দেশ আক্রমণ করণার্থে মোগল লোকদের সাহায্য করা ইংরাজদের উচিত ছিল, অতএব হীথ সাহেব বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তি অঞ্চল লুটপাট করিয়া চট্টগ্রামে গেলেন, কিন্তু তথাকার দুর্গ আশামতে জয় করা আপনার অসাধ্য দেখিয়া তথাহইতে ঢাকায় নবাবের নিকটে এক পত্র পাঠাইয়া ইংরাজদের প্রতি যে২ অন্যায় ঘটিয়াছিল তাহা নবাবকে জানাইতে স্থির করিলেন। তাহা করিয়া সেই অবাধ্য সাহেব পত্রের উত্তরপ্রাপ্তির অপেক্ষাতে ঐ স্থানে থাকিতে অসম্মত হইয়া আরাকান দেশে গিয়া তথাকার রাজার নিকটে এই কথা পাঠাইয়া দিলেন, আপনি যদি এই রাজ্যে বসতি করিতে ইংরাজ লোকদিগকে অনুমতি দেন, তবে আমি মোগল লোকদিগকে তাড়াইয়া দেওনে আপনকার সাহায্য করিব। পরে তাঁহার উত্তর দুই সপ্তাহের মধ্যে না আসাতে হীথ সাহেব অধৈর্য্য হইয়া কোম্পানির কর্ম্মাধ্যক্ষ ও মন্ত্রিগণ ও

ভৃত্যগণকে এবং তাঁহাদের বাণিজ্যদ্রব্য সকল জাহাজে আরোহণ করাইয়া আপনার যে পঞ্চদশ জাহাজ ছিল, সেই সকলকে মান্দ্রাজে চালাইলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে ইংরাজদের বাণিজ্য আরম্ভ করণের পরে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর গত হইলে তাঁহারা তদ্দেশীয় আপনাদের সমস্ত বসতিস্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। পরে বাদশাহ রাজ্যের মধ্যে ইংরাজদের সমস্ত কারখানা জব্দ করিতে ও তাহাদের সমস্ত সংস্থান আটক করিতে আজ্ঞা করিলেন, তথাপি বোম্বাই ও মান্দ্রাজ খাত ও দুর্গাদিদ্বারা সুরক্ষিত হওয়াতে উক্ত দুই স্থানে তাঁহাদের কিছু ক্ষতি হইল না।

মহারাজের সেই আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহা জানিয়া নবাব শাইস্ত খাঁ বঙ্গদেশে স্থিত কোম্পানির সমস্ত দ্রব্য আটক করিলেন। কিন্তু ঢাকাস্থিত দুই কর্ম্মাধ্যক্ষের পায়ে তিনি বেড়ী দেন, কিম্বা তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার নায়েব দিলেন, এ বিষয়ে গ্রন্থের ঐক্য নাই। অনন্তর শাইস্ত খাঁ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত বঙ্গদেশের রাজত্ব ত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তিনি ইউরপীয় লোকদের সহিত কঠিন ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকদের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে এক টাকায় আট মোন চাউল বিক্রীত হইত, এমত জনশ্রুতি আছে। এবং এমত সুখদায়ক সময় যেন প্রজাদিগের স্মরণে থাকে, এই আশয়ে তিনি ঢাকা ত্যাগ করণের সময়ে যে দ্বার দিয়া নগরহইতে বহির্গত হইলেন, সেই দ্বার ইষ্টকদ্বারা বদ্ধ করিয়া এই লিপি তাহাতে লিখিলেন, আমার ন্যায় শস্য সুলভ না করিলে ইহার পরে কোন নবাব এই দ্বার দিয়া গমন না করুক।

৭ অধ্যায়।

১৬৮৯ শালে যে ইব্রাহীম খাঁ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার পিতা আলি মর্দ্দন দিল্লীর নিকটে এক খাল খনন করাতে অতি সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ইব্রাহীম দয়াবান ছিলেন এবং ন্যায্য বিচার করিতেন, কিন্তু যুদ্ধেতে নিপুণ না হওয়াতে সর্ব্বদা অস্থির বঙ্গদেশের কর্ত্তৃত্ব করণে বড় পারক ছিলেন না। যে দুই ইংরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ পূর্ব্বনবাবদ্বারা কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি অবিলম্বে মুক্ত করিলেন, তথাপি ইংরাজ ও মোগলদিগের মধ্যে বিবাদ নিবৃত্ত হইল না। ইংরাজেরা সমুদ্রে প্রবল হওয়াতে মোগলদের যত জাহাজ ভারতবর্ষহইতে সমুদ্রে যাইত, সেই সকলকে হস্তগত করিতেন, তাহাতে মক্কাতীর্থ রুদ্ধ হইল। শেষে আওরঙ্গজেব অনেক সন্ধি প্রস্তাবের পরে ইংরাজদিগের পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিতে এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহাদিগকে দেশে বাস দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই নিয়মে বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তার সহিত সন্ধি স্থির হইল, এবং ইব্রাহীম যখন বঙ্গদেশে নিযুক্ত হইলেন, তখন তিনিও ইংরাজদিগকে পুনর্ব্বার আহ্বান করণের আজ্ঞা পাইলেন। এই কারণ তিনি অবিলম্বে মান্দ্রাজে পত্র পাঠাইয়া চার্ণক সাহেবকে বাদশাহের অনুমতি জানাইলেন, এবং পূর্ব্বদোষ ক্ষমা করিয়া ইংরাজদিগের মঙ্গল করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এমন পত্র পাইয়া চার্ণক সাহেব সমুদয় ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আইলেন, এবং ১৬৯০ শালের ২৪ আগষ্ট সূতানুটীতে জাহাজহইতে অবতরণ করিলেন, এবং সেই দিন কলিকাতা নগরের উৎপত্তির দিনস্বরূপে গণিত হওনের যোগ্য। পরবৎসরে

দিল্লীহইতে বাদশাহের এই হসব উল হুকুম অর্থাৎ রাজকীয় আদেশ লব্ধ হইল, যে ইংরাজ লোকেরা অতি নম্রতা পূর্ব্বক আপনাদের কৃত দোষের ক্ষমা পাইতে বিনতি করাতে মহারাজ প্রতিদিন প্রজাদিগের সহিত যে দয়া ব্যবহার করেন, তদনুসারে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। এই রূপে তিন সহস্র টাকা বার্ষিক করপ্রদানে ইংরাজেরা পুনরায় বাণিজ্য করণের অনুমতি পাইলেন। কিন্তু প্রাচীরাদি সুরক্ষার উপায় বিনা আমরা নির্ভয়ে থাকিতে পারি না, ইহা বুঝিয়া তাঁহারা আপন বসতিস্থান সুরক্ষিত করিতে ব্যগ্র হইলেন। এবং তদ্রূপ দুর্গাদি নির্ম্মাণের অনুমতি লইবার নিমিত্তে কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স চল্লিশ সহস্র টাকার ব্যয়ে সম্মত হইয়া প্রধান কম্মাধ্যক্ষকে ইহা লিখিয়া দিলেন, যে যদি আমরা দুর্গ ও টঙ্কশালা স্থাপন করিতে না পারি, তবে বঙ্গদেশে আমাদের বাণিজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা অনাবশ্যক। কিন্তু দেশের কর্ত্তা মোগল লোকেরা ইংরাজদের এই বাঞ্ছার বিষয়ে সন্দেহ করাতে অসম্মত হইলেন। কলিকাতা নগর স্থাপনের দুই বৎসর পরে চার্ণক সাহেব প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যে প্রসিদ্ধ কলিকাতা নগর আশিয়া দেশের মধ্যে ইউরপীয়দের প্রধান বাসস্থান, তাহার বড় গির্জার অঙ্গনে সেই নগরের সৃষ্টিকর্ত্তা ঐ সাহেবের দেহ নিখাত আছে। এবং তিনি যে বারাকপুর নামক গ্রামের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই গ্রামকে চার্ণক বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ সাহেবের নাম অদ্যাপি রক্ষা করেন।

অনন্তর নির্ব্বিবাদে কর্ম্ম চলিল। বঙ্গদেশে বাণিজ্য অল্প হইলেও সুস্থির ছিল, কিন্তু তাহা যাবৎ ক্ষুদ্র সূতানুটী গ্রামের সীমা অতিক্রম না করে, তাবৎ আমরা কৃত-

কার্য্য হইতে পারিব না, ইহা কোম্পানি দেখিলেন, যেহেতুক ১৬৯৪ শালে ঐ স্থানে লব্ধ বার্ষিক শুল্ক এক শত সত্তর টাকার অধিক ছিল না। অতএব তাঁহারা নিকটবর্ত্তি কএকটি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া ভূমির কর লইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য প্রতিপালন করিতে অতি ইচ্ছুক হইলেন। ইতোমধ্যে কাপ্তান কিদ সাহেব কোম্পানির অনুমতি ব্যতিরেকে কএক জন প্রধান কুলোদ্ভব যোদ্ধারা ভারতবর্ষের বাণিজ্য করণার্থে প্রেরিত হইয়া নাবিক তস্করতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, ও মক্কাগামি অনেক যাত্রিকের সহিত দুই খান মোগলদিগের জাহাজ বলপূর্ব্বক হস্তগত করিলেন। ইহাতে বাদশাহ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কোম্পানির ও অন্য ইংরাজ বণিকদিগের মধ্যে কিছু বিশেষ জ্ঞান না করিয়া কোম্পানির কারখানা সকল আয়ত্ত ও বাণিজ্য রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু বঙ্গদেশের সুবাদার ইব্রাহীম খাঁ কলিকাতার বণিকদিগকে রক্ষা করিয়া গুপ্ত ভাবে বাণিজ্য করিতে দিলেন।

ইংরাজেরা ও অপরদেশীয় লোকেরা আপন ২ কারখানা প্রাচীরাদিদ্বারা সুরক্ষিত করণের যে মানস উৎকোচদ্বারা ও বিনতিদ্বারা সিদ্ধ করণে পারক হন নাই, তাহা ১৬৯৫ শালে দৈবঘটনার দ্বারা সিদ্ধ হইল। সভাসিংহ নামক যে হিন্দু জমীদার বর্দ্ধমান অঞ্চলের জেত্র ও বেন্দেহ নামক দুই গ্রামের অধিপতি ছিলেন, তিনি তথাকার রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়া উড়িষ্যাস্থিত পাঠানদিগের প্রধান রহীমখাঁর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পরে তাঁহাদের দুই জনের সৈন্য মিলিত হইলে তাঁহারা রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। সেই যুদ্ধেতে রাজা পরাজিত ও হত হওয়াতে তাঁহার সম্পত্তি ও পরিজন ঐ উপদ্রোহ-

কারিদিগের হস্তগত হইলে তাঁহার পুত্র জগৎরায় ঢাকায় পলাইয়া নবাবের নিকটে আপন বিপদের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহাতে নবাব ঐ উপদ্রোহিদিগকে দমন করণার্থে যশোহরের ফৌজদারকে তিন সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু ইব্রাহীমের সময়ে রাজনীতি দৃঢ়রূপে প্রচলিত না হওয়াতে এতদ্দেশীয় কোন প্রদেশে রাজকীয় কর্ম্ম নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ হইত না. তাহাতে ঐ অল্পসংখ্যক সৈন্য কষ্টে সংগৃহীত হইল. এবং হুগলীতে উপস্থিত হইয়া শত্রুদর্শনমাত্রে উদ্বিগ্ন হইয়া পুনরায় নদী পার হইয়া পলায়ন করিল। সেই ধনশালি মহানগর অবিলম্বে উপদ্রোহকারিদিগের হস্তগত হইল।

ওলন্দাজ ও ফরাসিরা তৎক্ষণাৎ সুবাদারের পক্ষীয় হইলেন এবং ইংরাজেরাও কিঞ্চিৎ পরে তাহাই করিলেন। উপদ্রোহের উপক্রম হইলে তাঁহারা সকলে আপন ২ সম্পত্তি রক্ষার্থে কতিপয় বেতনগ্রাহি পাইগ রাখিয়া সুবাদারের নিকটে কারখানা সুরক্ষিত করণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে অনুজ্ঞা দেওয়াতে তাঁহারা সেই উপলক্ষ্যে স্ব ২ বাসস্থান প্রাচীরাদিদ্বারা বেষ্টন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের কারখানা রক্ষার্থে যে দুর্গ কএক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে উত্তমরূপে সুধরাণ হইল। এবং কলিকাতানিবাসি ইংরাজ লোকেরাও অবিলম্বে সূতানুটী গ্রাম সুরক্ষিত করিতে যত্নবান হইয়া. যাবৎ দুর্গ উপযুক্তরূপে প্রস্তুত না হয়, তাবৎ প্রত্যেক জনকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করাইলেন। সেই যে পুরাতন গড় লালদিঘীর ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী

ছিল ইহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার শেষচিহ্ন দূরীকৃত হইল। এইরূপে ১৬৯৫ শালে ইংরাজেরা প্রয়োজনীয় রক্ষার্থে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে উপক্রম করিলেন, তাহার বৃদ্ধি তদবধি অল্পে২ করিলেন, অর্থাৎ তাহা যেন শত্রুদিগের বোধগম্য না হয় এই নিমিত্তে গুপ্তরূপে তাহা করিলেন।

ইতোমধ্যে ঐ রাজদ্রোহাচারিগণ হুগলী নগর হস্তগত করাতে অতি সাহসী হইয়া দেশ লুট করিতে চতুর্দ্দিগে সৈন্য পাঠাইলে হতভাগ্য প্রজাগণের অনেক বাঁক চুঁচুড়াতে আশ্রয় লইল, তাহাতে তথাকার ওলন্দাজেরা সেই উপদ্রব শান্ত করণার্থে দুই খান যুদ্ধজাহাজ হুগলীতে প্রেরণ করিয়া ঐ জাহাজহইতে এমত গোলাবর্ষণ করিলেন, যে বিদ্রোহি সকল স্থানান্তরে যাইতে ব্যগ্র হইয়া সাতগ্রামে পলায়ন করিলেন, এবং তথাহইতে সভাসিংহ নবদ্বীপ লুট করিতে রহীমখাঁকে প্রেরণ করিলেন।

বর্দ্ধমানের যে সকল লোক বন্দি হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তত্রস্থ রাজার পরম সুন্দরী কন্যাকে সভাসিংহ আত্মভোগার্থে রাখিয়াছিলেন, এবং রহীমখাঁ স্থানান্তরে গেলে পর তিনি ঐ সুখভোগ করিতে উপক্রম করিলেন, কিন্তু তাহাকে আলিঙ্গন করিবামাত্র ঐ যুবতী এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া অগ্রে সভাসিংহের গাত্রে পরে আপনার বক্ষস্থলে প্রবেশ করাইলেন। সেই আঘাতে সভাসিংহ শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিলে রহীমখাঁ উপদ্রোহিদিগের আধিপত্যপদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে২ নানা প্রদেশ বশীভূত করিলেন। তাঁহার সেইরূপ উপদ্রবের নূতন সম্বাদ প্রায় প্রতিদিন সুবাদারের কর্ণগোচর হইলেও তিনি কোন চেষ্টা করিতেন না। যখন তাঁহার ভৃত্যেরা তাঁ-

হাকে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতেন, তখন তিনি যুদ্ধ-দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী নষ্ট করা অনুচিত, ইহা বলিয়া উত্তর করিতেন, শত্রুদিগকে বারণ না করিলে তাহারা স্বয়ং ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। সুবাদারের এইরূপ আলস্যদ্বারা রাজদ্রোহিদিগের দুঃসাহসের বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদের এক দল সৈন্য মুর্শীদাবাদ যাইয়া তথাস্থিত মোগলদিগের পাঁচ সহস্র সৈন্যকে পরাজয় করিয়া ঐ নগর লুট করিল, কিন্তু তাহাদিগের অন্য এক দল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ তাড়িত হইল। ১৬৯৭ সালের মার্চ মাসে তাহারা রাজমহল লইয়া মালদহ আক্রমণ করিয়া তত্রস্থ ইংরাজদিগের কারখানার অসীম সম্পত্তি লুটিয়া লইল। ঐ সময়ে যে সকল দেশ তাহাদের হস্তগত ছিল তাহার বার্ষিক রাজকর ষষ্টি লক্ষ টাকা ছিল, এবং তাহাদের সৈন্যের সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও ত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক ছিল।

এই অদ্ভুত ঘটনার কথা সমাচারসম্পাদকদিগের নিকটে শুনিয়া আওরঙ্গজেব বাদশাহ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া অবিলম্বে নিজ পৌত্র আজিম ওষাণকে বঙ্গদেশের সুবাদার করিলেন, এবং সৈন্য সকল আপন বীরত্ববিশিষ্ট পুত্র জবরদস্ত খাঁর হস্তে সমর্পণ করিতে ইব্রাহীমকে আজ্ঞা করিলেন। ঐ শক্তিমান্ সৈন্যাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজদ্রোহিদিগের পশ্চাতে যাইয়া ভগবান্ গোলায় তাহাদের লাগাইল পাইয়া প্রথম দিনে তাহাদের কামান সকল কর্ম্মের অযোগ্য করিলেন, এবং দ্বিতীয় দিনে যুদ্ধদ্বারা শত্রুদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। তাহাতে রহীম খাঁ তাড়িত হইয়া মুর্শীদাবাদহইতে বর্দ্ধমানে এবং তথাহইতে উড়িষ্যা দেশে পলায়ন করিলেন।

পরে জমীদারেরা পুনর্ব্বার বাদশাহের অধীন হওয়াতে দেশ বিরাম ভোগ করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নূতন সুবাদার আজিম ওষাণ পাটনায় আসিয়া যখন জবরদস্ত খাঁর অসম্যক্ যুদ্ধের সংবাদ পাইলেন, তখন কি জানি আমি পঁহুছিলে কোন মহৎকর্ম্ম করণের সুযোগ পাইব না, এই ভয়ে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। সেই আজ্ঞা কেবল হিংসার ফল ইহা বুঝিয়া জবরদস্ত সৈন্যাধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং অনায়াসে আজ্ঞা পাইয়া আপনার অধীন ও আসক্ত আট সহস্র জন সৈন্যকে সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে গেলেন। ঐ লোকেরা বঙ্গদেশীয় সৈন্যের সার-ভাগ হওয়াতে তাহাদের অভাব প্রযুক্ত দেশ প্রায় রক্ষক-হীন হইল। পরে আজিম ওষাণ নামক ঐ রাজপুত্র বর্দ্ধ-মানে আসিয়া বসতি করিলে জমীদার প্রভৃতি অনেক লোক তাঁহার স্তব করিলেন, কিন্তু লৌহবৎ শক্তিমান জবরদস্তহইতে ভীত রহীমখাঁ ঐ কোমল রাজকুমারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন, এবং যে সময়ে সভাস্থ সকলে আলস্য ভোগে মগ্ন ছিল, এমত সময়ে হুগলী ও নবদ্বীপ লুট করিয়া বর্দ্ধমানের অতি নিকট পর্য্যন্ত গেলেন।

আজিম ওষাণের বর্দ্ধমানে আগমন হইলে ইংরাজ লোকেরা কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক আপনাদের নিকটবর্ত্তি দুই গ্রামের অধিকারী হইতে ইচ্ছুক হইয়া স্তান্লি সাহেবকে দূতরূপে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। তিনি সুবাদারের পারিতোষিক এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, এবং দেওয়ানের পারিতোষিক আট শত টাকার বনাত সঙ্গে করিয়া গমন করিলেন, যেহেতুক ধন সঞ্চয় করা আজিম ওষাণের এই একমাত্র চেষ্টা ছিল, এবং উপঢৌকন না

পাইলে তিনি কাহারো প্রতি কোন অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি ইংরাজদের দূতকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অর্থ লইলেন, এবং ১৬৯৮ শালের জুলাই মাসে তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান সময়ের কলিকাতা মহানগরীর ভূমি ক্রয় করণের অনুমতি দিলেন। পরবৎসরে অর্থাৎ ১৬৯৯ শালে ডাইরেক্তর সাহেবেরা বঙ্গদেশকে এক প্রেসিডেন্সি, অর্থাৎ প্রধান শাসন-কর্ত্তার বাসস্থান) করিলেন, এবং সর চার্লস আইর গড়ের নির্ম্মাণ সিদ্ধ করিয়া তাৎকালিক ইংলণ্ড দেশীয় রাজার নামানুসারে তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম করিলেন।

রহীম খাঁ পুনরায় যুদ্ধ করিতে উপক্রম করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহাকে দমন করণার্থে যুদ্ধ-যাত্রা করা আজিম ওষাণের উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া, যদি তুমি বাদশাহের আজ্ঞাবহ হও, তবে আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিব, এই রূপ কথা কহিতে তাঁহার নিকটে দূত পাঠাইলেন। পরে তোমার প্রধান মন্ত্রী খওয়াজা অনায়াশ আমার নিকটে আইলে আমি তোমার আজ্ঞাবহ হইব, রহীম খাঁর এই রূপ উত্তর পাইয়া ঐ স্থূলবুদ্ধি রাজপুত্র উক্ত মন্ত্রিকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। সেই মন্ত্রী রাজদ্রোহিদের শিবিরে গমন করিলে তাহারা প্রথমে আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, পরে প্রস্থানকালে খণ্ডবিখণ্ড করিল। অনন্তর রহীম খাঁ ক্ষমার কোন প্রত্যাশা না দেখিয়া অন্যমনস্ক রাজপুত্রকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে স্থির করিয়া বহু সংখ্যক পাঠান সৈন্যদলদ্বারা তাঁহার শিবির বেষ্টন করাইলেন। আজিম ওষাণ শীঘ্র হস্তী আরোহণ করিলে শত্রুগণ তৎক্ষণাৎ অতি প্রচণ্ডরূপে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিল। তাহাতে তাঁহার প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায়

না দেখিয়া তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে হামীদ খাঁ নামক মহাবীর উচ্চৈস্বরে আমি রাজপুত্র, ইহা বলিয়া রহীম খাঁর সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে ভয়ানক সংগ্রাম হইলে শেষে হামীদ ঐ রাজদ্রোহির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার সৈন্য সকল আপন সেনাপতির পরাজয় দেখিয়া পলাইয়া গেল। ঐ উদার হামীদ এই কর্মের পারিতোষিকরূপে এক উপাধি পাইয়া ফৌজদারীপদে নিযুক্ত হইলেন। পরে আজিম ওস্মাণ বর্দ্ধমানে আরও কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া তথাকার আজিমগঞ্জ নামক নূতন বাজার করিলেন, এবং হুগলীতে নাবিক মাসুলের নিয়ম স্থির করিলেন। তদনুসারে মুসলমানদের শত করা আড়াই অংশ, এবং হিন্দুদিগের পাঁচ অংশ, ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের সাড়ে তিন অংশ দিতে হইল, কিন্তু ইংরাজেরা বাদশাহের আজ্ঞাপত্রানুসারে তিন সহস্র টাকা বার্ষিক শুল্ক দিতেন, এই কারণ তাঁহাদিগকে কোন কর দিতে হইল না। এবং তাঁহাদ্বারা স্থলজ শুল্কের নিয়মও স্থির করা গেল, এমত জনশ্রুতি আছে।

ঐ সময়ে কলিকাতায় ইংরাজদের বাসস্থান বৃদ্ধি ও উন্নতি পাইতেছিল। তাঁহারা যে তিন গ্রামের অধিকার পাইয়াছিলেন, সেই তিন গ্রামের ভূমি নদীতীরে দেড় ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধ ক্রোশ চৌড়া ছিল। এবং সেই স্থানে সকলের সম্পত্তি সুরক্ষিত হওয়াতে অনেক ধনবান হিন্দু লোক সেই স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এবং যদ্যপি হুগলীর ফৌজদার ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত ঐ নূতন নগরে এক জন কাজী রাখিবার কথা কহিলেন, তথাপি উপঢৌকনদ্বারা তাঁহার মানস ফিরিল।

জাফের খাঁ কিম্বা মুরশীদ কুলি খাঁ নামক যে ব্যক্তি

মুরশীদাবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন এবং মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বঙ্গদেশের শাসন করিলেন, তাঁহার কথা এক্ষণে কহিতে হইবে। তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র সুতরাং প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বাল্যকালে হাজি সুফিয়া নামে এক জন মুসলমান বণিক তাঁহাকে ক্রয় করিয়া তাঁহার ত্বকচ্ছেদ করিলেন, এবং ইস্পাহান নগরে লইয়া তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জনে অতি মনোযোগ করিলেন। ঐ উপকারি ব্যক্তির পরলোক হইলে পরে তিনি দেকান দেশে গিয়া বেরারের দেওয়ানের নিকটে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তথায় তাঁহার এমত নৈপুণ্য ও বুদ্ধি প্রকাশ পাইল, যে আওরঙ্গজেব বাদশাহ তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে হাইদ্রাবাদের দেওয়ান করিলেন, এবং সেই কর্ম্মেও বিশ্বাসপাত্র হওয়াতে তিনি ১৭০১ শালে বঙ্গদেশের দেওয়ান হইলেন। আকবরের রাজত্ব অবধি আওরঙ্গজেবের রাজত্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের নাজিম ও দেওয়ান এই দুইয়ের এক জনদ্বারা অন্যের প্রবঞ্চনা যেন নিষ্ফল হয়, এই জন্যে দুই জনের কর্ম্ম এক জনকে দেওয়া যাইত না। সৈন্যদ্বারা দেশের রক্ষা ও যুদ্ধ নিবারণ করা এবং ভয়দ্বারা প্রজাদিগকে সদাচরণে প্রবৃত্তি দেওয়া নাজিমের কর্ম্ম ছিল, কিন্তু রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করণের ভার দেওয়ানে অর্পিত ছিল। নাজিম আপন বৃত্তি ও আপনার অধীন সৈন্যগণের বেতন দেওয়ানহইতে পাইতেন, এবং তন্নিমিত্তে তাঁহাকে অনুজ্ঞা লিখিয়া পাঠাইতে হইত, তাহাতে দেওয়ান যদ্যপি নাজিমের ন্যায় উচ্চপদান্বিত ছিলেন না, তথাপি অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

মুরশীদ কুলি খাঁ কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া ঢাকা রাজধানীতে গমন করিলেন, এবং রাজস্বের অতিশয় অনিয়ম থাকাতে

তাহার বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি রাজকীয় ধনব্যয়ে অতি সাবধান হওয়াতে রাজকুমার ও তাঁহার সভাস্থ লোকেরা যে পরিমাণে অর্থ লইতে প্রয়াস করিলেন সেই পরিমাণে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন না, একারণ তাঁহার বিপরীতে কুপরামর্শ করিতে লাগিলেন। এক দিন দেওয়ান সভায় যাইতেছিলেন এমত সময়ে রাজকুমারের কতিপয় সৈন্য বাগ্রতা পূর্ব্বক আপন ২ বেতন চাহিয়া তাঁহার পথ রোধ করিল। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ পালকী হইতে নামিয়া আপন খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া ভৃত্যাদিগকে পথ পরিষ্কার করিতে আজ্ঞা করিলে ঐ সৈন্যগণ তাঁহার সাহস দেখিয়া ছিন্নভিন্ন হইল। দেওয়ান রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং এই কুমন্ত্রণার মূলকারণ আপনি আছেন, ইহা বলিয়া খড়্গে হস্ত দিয়া কহিলেন, যদি আমার প্রাণনাশ করিতে আপনকার অভিপ্রায় হয়, তবে আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি, নতুবা এমত কর্ম্ম আর কদাচ করিবেন না। রাজপুত্র বাদশাহের কঠিন স্বভাব জ্ঞাত হওয়াতে ভয় পূর্ব্বক আপন দোষ প্রক্ষালনার্থে অনেক কথা কহিলেন। কিন্তু দেওয়ান তাঁহাতে বিশ্বাস না করিয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া বাদশাহের নিকটে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে বাদশাহ রাজকুমারকে কঠিন পত্র লিখিলেন ফলতঃ যদি তিনি দেওয়ানের শরীরে কিম্বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাহার সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন ইহা তাঁহাকে জানাইলেন, এবং বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া বেহার দেশে বাস করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে রাজপুত্র অগ্রে রাজমহলে গমন করিলেন, পরে তথাকার বায়ু পীড়াজনক বুঝিয়া ১৭০৩ শালে পাটনায়

গমন করিলেন। এবং তাঁহার নামানুসারে পাটনার আজিমাবাদ এই নামান্তর হইল।

ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশীয় পার্লিয়ামেণ্টের (অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার) অনুমতিদ্বারা প্রথম কোম্পানির প্রতিযোগী এক নূতন কোম্পানি ভারতবর্ষের বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নাম ইংলিশ কোম্পানি হইল, এবং পুরাতনের নাম লণ্ডন কোম্পানি ছিল। ঐ নূতন কোম্পানি ভারতবর্ষের হুগলী প্রভৃতি অনেক স্থানে কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রেরণ করিলে দুই কোম্পানির প্রতিযোগিতাদ্বারা উভয় পক্ষের এমত ক্ষতি জন্মিল, যে প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ইংলণ্ডদেশীয় রাজমন্ত্রিগণ উভয়ের সংযোগদ্বারা ঐক্য করিতে আবশ্যক বুঝিলেন, এইরূপে দুই পক্ষের সংযোগ হইলে তাহাদের ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই যে নাম স্থির হইল, তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

১৭০৩ শালে মুরশীদ কুলি খাঁ রাজস্বের হিসাব পরিষ্কার করিয়া বাদশাহের সম্মুখে দেখাইতে দেকানে গমন করিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষিক্ত হওনাবধি বঙ্গ ও বেহার দেশের রাজকর কদাচ এমত অধিক হয় নাই, অতএব তিনি দেওয়ানের উদ্যোগে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বঙ্গ ও উড়িষ্যাদেশের নায়েব নাজিম করিলেন, এবং সম্ভ্রমজনক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন, তাহাতে আজিম ওসান অতি বিরক্ত হইলেন, কিন্তু আপন পিতামহের স্বভাব জ্ঞাত হওয়াতে কোন আপত্তি করিলেন না।

১৭০৭ শালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে আওরঙ্গজেব বাদশাহ একানব্বই বৎসর বয়স্ক হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে মোগলদিগের রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তারিত ছিল, কিন্তু তদবধি হ্রাস পাইতে লাগিল। তাঁহার

তিন পুত্রের মধ্যে আজিম ওষাণের পিতা জ্যেষ্ঠ ছিলেন। পিতাকর্তৃক তিন জনের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হইলেও তাঁহার মৃত্যুর পরদিনে মধ্যম পুত্র আজিম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে আজিম ওষাণ পিতামহের পীড়িত হওনের সম্বাদ শুনিবামাত্র অবিলম্বে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া সুশিক্ষিত সৈন্যসামন্ত ও সঞ্চিত আট কোটি টাকা সঙ্গে লইয়া রাজত্ব বিষয়ে যত্ন প্রকাশ করিতে আইলেন, এবং পিতামহ মরিয়াছেন ও পিতৃব্য একাকী রাজত্ব করিতে চেষ্টান্বিত আছেন, ইহা অবগত হইয়া আপন পিতাকে রাজত্ব দিতে উদ্যোগ করিলেন, এবং আগরা নগর হস্তগত করিলেন। কিয়ৎকালানন্তর বঙ্গদেশের বার্ষিক রাজস্ব যে এক কোটি টাকা দিল্লীতে যাইতেছিল, তাহা পথিমধ্যে লইলেন। শেষে আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের অর্থাৎ দুই ভ্রাতার দুই সৈন্যসামন্ত আগরার নিকটবর্ত্তি সাজোরের সমভূমিতে সংগ্রাম করিলে আজিমশাহ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া আপন দুই পুত্রের সহিত রণস্থলে হত হইলেন, এবং জয়ী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেহাদার শাহ্ এই উপাধি লইয়া রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জয়যুক্ত হওন কেবল আজিম ওষাণের যত্নের ফল হওয়াতে তাঁহার পিতা তাঁহার পারিতোষিকরূপে তাঁহাকে পুনরায় ঐ তিন দেশের সুবাদার করিলেন, এবং মুরশীদ কুলিখাঁকে আপন নায়েব করিয়া বঙ্গদেশে রাখিতে অনুমতি দিলেন। ঐ রাজকুমার মহম্মদের কুলোদ্ভব সায়দ বংশীয়দের বন্ধু হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে দুই জনকে উচ্চপদ দিলেন, অর্থাৎ সায়দ আবদল্লা খাঁকে এলাহাবাদের ও সায়দ হোসেন খাঁকে বেহারের শাসনকর্ত্তা করিলেন।

১৭১২ শালে বেহাদার শাহ পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া লাহোরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎকালে তাঁহার সমস্ত পুত্র শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁহারা প্রত্যেকে রাজত্বাভিলাষী হইয়া প্রীতিতে কোন নিয়ম নিশ্চয় করিতে না পারাতে যুদ্ধদ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করিতে স্থির করিলেন, তাহাতে যে সংগ্রাম উপস্থিত হইল তাহার মধ্যে আজীম ওসান এক পক্ষে এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ অন্য পক্ষে ছিলেন। তিনি পরাজিত হইলেন, এবং যে হস্তির উপরে আরূঢ় ছিলেন, সেই হস্তী এক কমানের গোলাতে আহত হইয়া স্বীয় প্রভুর সহিত রাবী নদীতে মগ্ন হওয়াতে উভয়ের প্রাণবিয়োগ হইল। পরে মোইস উদ্দীন নামক আজীম ওসানের ভ্রাতা তাঁহার পুত্রকে বধ করিয়া জেহান্দর শাহ এই উপাধি লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই স্থানে অগ্রে দিল্লীসম্বন্ধীয় আর দুই এক কথা লিখিয়া পরে বঙ্গদেশের বৃত্তান্ত পুনঃ প্রকাশ করিব।

১৭০৭ শালে পিতার উপকার করণার্থে বঙ্গদেশ ত্যাগ করণ সময়ে আজীম ওসান আপনার যে পুত্র ফরক সেরকে আপন প্রতিনিধিরূপে তথায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই রাজকুমার পরবৎসরে মুরশীদাবাদে যাইয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রীতিভাবে শুবাদারের প্রতিবাসী হইলেন, রাজকীয় কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন না। ১৭১২ শালে পিতামহ বেহাদার শাহের এবং পিতার মৃত্যু হইলে ফরক সের দিল্লীর রাজত্ব প্রাপ্ত হওনের নিমিত্তে মুরশীদ কুলি খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি অস্বীকৃত হইয়া সমারোহ বিনা বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, তাহাতে ফরক সের যাত্রা করিয়া পাট-

নায় আসিয়া এক সরাইতে থাকিলেন। সেই সময়ে ফরক সেরের পিতাদ্বারা উন্নতি প্রাপ্ত সায়দ হোসেন আলী বেহারের শুবাদার ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপকারকের পুত্র বিনয় পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেও হোসেন আলী জেহান্দর শাহের শক্তিতে ভীত হইয়া তাহা অস্বীকার করিলেন, তথাপি ফরক সের, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন, এই রূপ প্রার্থনা করিলে শুবাদার তাহা অস্বীকার করিতে না পারাতে ঐ সরাইতে আসিলেন, এবং তাহার এক গুপ্ত গৃহে আনীত হইলে রাজকুমার তাঁহার নিকটে এই নিবেদন করিলেন, যে লাহোরের যুদ্ধের পরে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যান্য রাজকুমার সকল অতিশয় নির্দ্দয়রূপে হত হইলেন, এবং আমার যে পিতৃব্য সম্প্রতি রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার নিকটে আমিও কেবল মৃত্যুর কিম্বা কারাগারের অপেক্ষাতে আছি, অতএব যাহাতে আমি রাজ্য প্রাপ্ত হই তন্নিমিত্তে আপনকার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই সকল বিনয় বাক্য শুনিয়াও হোসেন অসম্মত হইলে অকস্মাৎ ফরক সেরের যুবতী কন্যা তিরস্করিণীর পশ্চাৎহইতে আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিলেন, আপনি আমার পিতার ও তাঁহার হতভাগ্য পরিবারের প্রতি দয়া করুন, এবং আমার পিতামহদ্বারা আপনকার উন্নতি হইল ইহা স্মরণ করুন; আপনি মহম্মদের বংশোদ্ভব, অতএব উপকার পাইলে কখন তাহা বিস্মৃত হইবা না, তাঁহার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা আপনকার অনুচিত। ঐ কন্যা এইরূপ কথা কহিতেছে এমত সময়ে আজীম ওষাণের বিধবা পত্নীও সম্মুখে আসিয়া তদ্রূপ নিবেদন করিতে

লাগিলেন, এবং তিরস্কারিণীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী অবলাগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে হোসেন আলী এতদ্রূপ মায়া রোধ করিতে না পারাতে ফরুক সেরের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, আমার প্রাণ বিনা আর কিছু দিতে আমার অসাধ্য. কিন্তু আমি প্রাণের সহিত আপনকার সেবা করিব। পরদিনে হোসেন তাঁহাকে পাটনা নগরে প্রবেশ করাইয়া তিনি হিন্দুস্তানের বাদশাহ এই ঘোষণা করাইলেন। এই সকল ঘটনার সম্বাদ এলাহাবাদের সুবাদার সায়দ আবদুল্লার কর্ণগোচর হইলে তিনি অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আপন উপকারির পুত্র যে ফরুক সের তাঁহার পক্ষাশ্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে উক্ত দুই জন ভ্রাতা একপরামর্শ হইয়া তাঁহাকে দিল্লীর রাজত্ব দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমত সুযোগে বঙ্গদেশের মালিক রাজকর এলাহাবাদে আনীত হইলে সায়দ আবদুল্লা তাহা আটক করিলেন, এবং ফরুক সের রাজ্য প্রাপ্ত হইলে অনেক বৃদ্ধির সহিত যে অর্থ ফিরিয়া দিবেন, এমত অনেক অর্থ সায়দ হোসেন পাটনার বণিকদিগের নিকটে ঋণ লইয়া সেই উপায়দ্বারা কাশীতে গিয়া তথাকার বণিকদের নিকটেও ঐ নিয়মদ্বারা ঋণ লইলেন; পরে সৈন্যের বৃদ্ধি করিতে ২ নির্ব্বিঘ্নে এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া আবদল্লার সহিত মিলিত হইলেন, তাহাতে দুই ভ্রাতার পঁচিশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য ও কামানাদি উপযুক্ত বল হইল। শেষে ১৭১৩ শালের জানুয়ারি মাসে জেহান্দর শাহের ও ফরুক সেরের সৈন্য আগরার নিকটে সমস্ত দিবস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল, তাহাতে জেহান্দর শাহের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে কিয়ৎ কালানন্তর তিনি হত হইলেন, এবং ফরুক সের বাদশাহ

হইলেন। যদ্যপি মুরশীদ কুলি খাঁর আচরণদ্বারা তিনি অসন্তুষ্ট হইতে পারিতেন, তথাপি তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রাপ্ত পদে রাখিলেন, এবং মুরশীদ পূর্ব্বগত তিন বাদশাহের নিকটে যেমত বিশ্বস্তরূপে বার্ষিক কর পাঠাইতেন, তদ্রূপ তাঁহার নিকটেও পাঠাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য বঙ্গদেশের উন্নতির প্রধান কারণ আছে, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে মুরশীদ কুলি খাঁ সেই বাণিজ্য করিতে মোগল ও আরবি লোকদিগকে আশ্বাস করিলেন, কিন্তু বিদেশীয়দের বিশেষতঃ ইংরাজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত কারখানার বিষয়ে অতি সন্দিগ্ধ হওয়াতে তিনি যদবধি আপন শক্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত দেখিলেন, তদবধি শাহ সুজার ও আওরঙ্গজেব বাদশাহের অনুগ্রহদ্বারা প্রাপ্ত তাঁহাদের বিশেষ অধিকার অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় প্রজাদের ন্যায় শুল্ক দিতে বা পুনঃপুনঃ উপঢৌকন আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে কোম্পানি অসন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীতে বাদশাহের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিতে স্থির করিলে সেই কর্ম্মেতে কোম্পানির দুই জন অতি নিপুণ ভৃত্য এবং এতদ্দেশীয় কুমন্ত্রণার পটু খুজা সহান্দ নামক এক জন আর্ম্মাণী লোক এবং তাঁহাদের চিকিৎসকস্বরূপ উলিয়াম হামিল্টন সাহেব নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা যে সকল উপঢৌকন সঙ্গে লইলেন, তাহার মূল্য বোধ হয় তিন লক্ষ টাকা ছিল, কিন্তু তাহা দশ লক্ষ টাকা, এই রূপ কথা ঐ আর্ম্মাণিদেশীয় মহাশয় পত্রদ্বারা দিল্লীতে প্রকাশ করিলেন। সেই দূতগণ যে২ প্রদেশ দিয়া যাত্রা করিবেন, সেই২ প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি নিজ২ লোকদ্বারা তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে পাঠাইতে ফরকসেরের বাদশাহের আজ্ঞা ছিল। যে দুই

ভ্রাতার সাহাযাদারা ফরক সের বাকদ্ধ পাইয়াছিলেন, সেই দুই জন সাযদ তৎকালে রাজসভাস্থ সকলের মধ্যে উচ্চপদান্বিত ছিলেন, কিন্তু বাদশাহ তাঁহাদের নিকটে অতিশয় বাধিত হওয়াতে তাঁহাদিগকে বড় প্রেম করিতেন না, এই কারণ ঐ দূতগণ রাজসভাতে উপস্থিত হইয়া রাজমন্ত্রিগণের নিকটে না যাইয়া বাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র খোজা হোসেন নামক যে ব্যক্তি খাঁ দৌরান অর্থাৎ অর্থব্যয়ের অধ্যক্ষরূপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার নিকটে যাইয়া আপনাদের নিবেদন জানাইলেন।

ঐ দূতেরা অতি সমারোহ পূর্ব্বক বঙ্গদেশ ও পশ্চিম প্রদেশ দিয়া যাত্রা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া সুবাদার বিরক্ত হইলেন, যেহেতুক ইংরাজদিগকে আপনার অনধীন করিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় আছে, ইহা তিনি বুঝিলেন। এবং তাঁহাদের সেই অভিপ্রায় নিরর্থক করিতে তিনি যে চেষ্টা করিলেন, তাহা প্রায় সফল হইল, তথাপি তিনি শেষে কৃতকার্য্য হইলেন না, ইহার অদ্বিতীয় কারণ নিম্ন লিখিত ঘটনা। তৎকালে বাদশাহ রাজপুত বংশীয় রাজা অজিত সিংহ নামক এক জন হিন্দুর কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হওয়াতে সেই রাজকুমারী দিল্লীতে আনীতা হইলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহের গুরুতর পীড়া হইল, এবং তাহা চিকিৎসকদের অপ্রতিকার্য্য হওয়াতে বিবাহ হইতে পারিল না। শেষে খোজা হোসেনের পরামর্শানুসারে ইংরাজি চিকিৎসক ঐ হ্যামিল্টন সাহেব আহূত হইয়া বাদশাহকে সুস্থ করিলে বাদশাহ পরমসন্তুষ্ট হইয়া তিনি যে কিছু প্রার্থনা করিবেন তাহা দিতে স্বীকার করিলেন। হ্যামিল্টন সাহেব, বোটন সাহেবের ন্যায় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া দূতেরা যে নিমিত্তে আগমন

করিয়াছেন তাহাই করিতে মহারাজের অনুগ্রহ হউক, কেবল এই প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু বিবাহোৎসব প্রযুক্ত ছয় মাস পর্য্যন্ত দূতগণের নিবেদন শ্রুত হইল না। ইংরাজদিগের এই প্রার্থনা ছিল যেন কলিকাতাস্থিত কর্ম্মাধ্যক্ষ দস্তক অর্থাৎ স্বাক্ষরীকৃত ছাড়পত্র দিলে এতদ্দেশীয় ভূত্যগণ তন্মধ্যে লিখিত কোন দ্রব্য রোধ কিম্বা অনুসন্ধান না করেন; এবং মুরশীদাবাদের টঙ্কশালাতে যেন নবাবের মতো তিন দিন কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হয়; এবং এতদ্দেশীয় হউক কিম্বা ইউরপীয় হউক ইংরাজদের নিকটে ঋণিলোক সকল যেন কলিকাতাস্থিত কর্ম্মাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পিত হয়; এবং ইংরাজেরা যেন কলিকাতার নিকটবর্ত্তি আটত্রিশ নগর ও গ্রাম ক্রয় করিতে পারেন। ইংরাজদের এই সকল প্রার্থনাতে বাদশাহের মন্ত্রিগণ অনেক আপত্তি করিলেও শেষে সকলি দত্ত হইল। কিন্তু দূতগণ যে সময়ে বিদায় লইতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে রাজাজ্ঞাপত্রে বাদশাহ স্বাক্ষর করেন নাই, কেবল উজির স্বাক্ষর করিয়াছেন, ইহা শুনিতে পাইলেন। শেষে পুনঃ পুনঃ বাদশাহের নিকটে প্রার্থনা করিতে অন্য দুই বৎসর তথায় থাকিলে পরে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইল। এবং বোধ হয় বাদশাহ তখনও আপন আজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতেন না; কিন্তু সৌরাষ্ট্রের ইংরাজি গবরণর সৌরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ে গিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ পাইয়া কি জানি ইংরাজেরা পুনরায় মোগলদিগের জাহাজ সকল বলেতে লইয়া তীর্থযাত্রা বন্ধ করিবেন, এই ভয় পাইয়া রাজমন্ত্রিগণ ঐ আজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরীকৃত করিতে ব্যগ্র হইলেন।

১৭১৭ শালে সেই দূতগণ অতি সন্তুষ্ট হইয়া পুনরাগমন করিলেন, কিন্তু মুরশীদ কুলি খাঁ তাঁহাদিগকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অতি অসন্তুষ্ট হইলেন, কারণ যে আটত্রিশ গ্রাম তাঁহাদিগকে দত্ত হইয়াছিল, তাহা কলিকাতার দক্ষিণে নদীর উভয় তীরে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়াতে সেই অঞ্চলের অধিকারদ্বারা নদী এবং সমুদ্রজাত বাণিজ্য ইংরাজদের অধীন হইবে, ইহা তিনি বুঝিলেন, অতএব তিনি রাজাজ্ঞাপত্রে লিখিতে অন্য সকল আদেশ মানিতে সম্মত হইয়াও ঐ ভূমি কোন মতে তাঁহাদিগকে দাতব্য নহে, এমত বিচার করিয়া তথাকার সকল জমীদারকে ইহা লিখিলেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ এক অঙ্গুলি পরিমিত ভূমি ইংরাজদিগকে দেয়, তবে আমি তাহার সেই অপরাধ কখনো ক্ষমা করিব না। এই রূপে ইংরাজেরা সেই ভূমির বিষয়ে নিতান্ত বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু রাজাজ্ঞাপত্রের অন্য সকল আদেশদ্বারা তাঁহাদের অনেক ফল দর্শিল, এবং ঐ দূতগণের প্রত্যাগমনাবধি ইউরপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরা অন্য সকল স্থান অপেক্ষা কলিকাতায় অতি নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিলেন। তাহাতে চতুর্দ্দিগহইতে অনেক বণিক লোক তথায় আসিয়া ব্যাপার ও গৃহনির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। অল্প কালের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ মোন জাহাজে বোঝাই হইল, এবং ভারতবর্ষের অন্য সকল স্থান অপেক্ষা কলিকাতার সমুদ্রজাত বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইল।

১৭১৮ শালে দিল্লীস্থ রাজসভাদ্বারা মুরশীদ কুলি খাঁ বেহার ও বঙ্গ ও উড়িষ্যা এই তিন দেশের নাজিম ও দেওয়ান হইলেন। আকবরের অধিকারের পরে মোগল রাজ্যের কোন প্রজা এমত শক্তি প্রাপ্ত হন নাই। পর-

বৎসরে হতভাগ্য ফরক সের অতি নির্দ্দয়রূপে হত হইলে মুহম্মদ শাহ্ রাজত্ব পাইলেন। তাহাতে নাজিম আপন পূর্ব্বব্যবহারানুসারে সেই নূতন বাদশাহের নিকটে বার্ষিক রাজকর ব্যতিরেকে উপঢৌকন প্রেরণ করাতে পূর্ব্বপদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

মুরশীদ কুলি খাঁ আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় স্বাধীনরূপে বঙ্গদেশের শাসন করাতে সেই সময়ের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহ করণের নূতন নিয়ম করিলেন। বিশেষতঃ যে প্রাচীন জাইগিরদার পূর্ব্বে সেই কর্ম্ম করিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকে দূর করিয়া দেশকে তেরো চাক্‌লাতে বিভাগ করিলেন, তাহার মধ্যে দুই চাক্‌লা উড়িষ্যা দেশে, পাঁচ চাকলা গঙ্গার পশ্চিমদিগে, এবং ছয় চাকলা গঙ্গার পূর্ব্বদিগে ছিল। এই সকল বৃহৎ অংশ বিনা তিনি অনেক ক্ষুদ্র অংশ করিয়া বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় প্রকার অংশের রাজকর আদায় করণার্থে জমীদার নিযুক্ত করিলেন। দিনাজপুর ও নবদ্বীপ ও রাজশাহী প্রভৃতি স্থানের হিন্দু রাজগণের ঐশ্বর্য্য তাঁহার অনুগ্রহের ফল। উক্ত রাজগণের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার অধিকার সময়ে আপন ২ চাক্‌লার রাজকর সংগ্রহ করণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ২ ধনবান ও শক্তিবিশিষ্ট হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাদের কর্ম্ম পৈতৃক বলিয়া চিরস্থায়ি হইল। এই রূপে ১৭২৫ শালে রামজান নামক এক ব্রাহ্মণের হস্তে রাজশাহী সমর্পিত হইল। এবং সেই সময়ে রামনাথ নামক কর্ম্মেতে নিপুণ এক ক্ষুদ্র জমীদারকে দিনাজপুর দত্ত হইল। এবং নবদ্বীপ রঘুরাম নামক এক ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পিত হইল। কেবল বীরভূমিতে ও বসন্তপুরে সেই রূপ হইল না। বীরভূমি পূর্ব্বমতে পাঠান বংশীয় এক মুসলমানের হস্তে

সমর্পিত হইল। সেই ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষেরা সের শাহের সহিত এই দেশে আসিয়াছিলেন, এবং পশ্চিমস্থিত পর্ব্বতীয় লোকদের হইতে দেশের রক্ষার্থে সৈন্য রাখা তাঁহার আবশ্যক হওয়াতে তিনি রাজকোষে অল্প কর দিতেন, এবং বসন্তপুর দেশ পর্ব্বতময় ও তথাকার লোক দুষ্ট ছিল, এই নিমিত্তে যে বংশ সহস্র বৎসরাবধি তাহার শাসন করিয়াছিল, সেই বংশ পূর্ব্ববৎ তথায় কর্তৃত্ব করিল। রাজকর আদায় করণের কর্ম্ম নবাবদ্বারা হিন্দু লোকদিগকে দেওয়া যাইত, যেহেতুক তাঁহারা বাধ্যশালি এবং উত্তম হিসাবী ছিলেন।

ভূমির ঐ সকল মহালের জমীদারগণের হস্তে সমর্পণ করণের পূর্ব্বে মুরশীদ কুলি খাঁ বিজ্ঞ লোকদ্বারা উত্তমরূপে তাহা মাপ করাইয়া নিশ্চিত পরিমাণানুসারে করের নূতন নিয়ম করিলেন। এই রূপে রাজস্ব প্রায় এগারো লক্ষ টাকা বাড়িল। এতদ্দেশ মোগলদিগের বশীভূত হওনের পরে তৎকালে তৃতীয় বার রাজকরের নিয়ম স্থির করা গেল; এবং সেই যে গণনা ১৭২২ শালে সমাপ্ত হইল, তাহাতে এক কোটি বেয়াল্লিশ লক্ষ আটাশী সহস্র টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অর্থের মধ্যে রাজকীয় কর্ম্মার্থে অর্থাৎ দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও জলস্থলসৈন্যরক্ষা, এই সকলের নিমিত্তে তেত্রিশ লক্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক টাকার ব্যয় হইত, এবং তাহা যে ভূমিহইতে উৎপন্ন হইত, তাহাকে জাইগির বলা যাইত। এবং ব্যয়াতিরিক্ত যে অবশিষ্ট এক কোটি নয় লক্ষ ষাইট সহস্র টাকা বঙ্গদেশহইতে লব্ধ হইত, তাহা যে ভূমিহইতে জন্মিত, তাহাকে খালসা বলা যাইত। মুরশীদ কুলি খাঁ প্রতিবৎসর নিশ্চিত সময়ে সেই রাজকর দিল্লীতে বাদশাহের কোষে

পাঠাইতেন, এই কারণ নূতন বাদশাহ হইলেও পূর্ব্ববৎ ঐ তিন প্রদেশের সুবাদার থাকিতেন। তিনি সমুদায় নগদ টাকা প্রেরণ করাতে প্রতি বৎসরের আরম্ভকালে ঐ ধন, দুই শত কিম্বা অধিক গোরুর গাড়িতে বোঝাই করা যাইত, এবং নবাব ও তাঁহার মন্ত্রিগণ আপনারা মুরশীদাবাদহইতে কতক ক্রোশের পথ তাহার পাশ্বে যাইতেন, পরে তাহা এক জন নায়েব কো মোক্ষের নিকটে অর্পিত হইত, এবং তাহার সহিত ধনের রক্ষার্থে তিনশত অশ্বারূঢ় ও পাঁচ শত পদাতিক সৈন্য তাহা দিল্লীতে লইয়া যাইতেন। এই রূপে তিনি পোনের ষোলো বৎসরের মধ্যে সাড়ে ষোলো কোটি মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায়।

দেশের রক্ষা ও রাজকর আদায় করণার্থে তিনি কেবল দুই সহস্র অশ্বারূঢ় ও চারি সহস্র পদাতিক সৈন্য রাখিতেন। তাঁহার অধিকারের পূর্ব্বে নাজিম আত্মরক্ষার্থে তিন সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য রাখিতেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া বৎসরে দশ সহস্র টাকা রক্ষা করিতেন। হিসাবের বিষয়ে তিনি অন্য কাহাকে বিশ্বাস না করিয়া আপনি সমুদায় দেখিতেন, এবং কর সংগ্রহ করণে কঠিন ছিলেন। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ রাজ্যাংশের যে সকল জমীদার সেই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ এক টাকা বাকী রাখিতে সাহস করিতেন না, সকলে তাঁহার শক্তিতে এমত ভীত ছিলেন, যে দূতের প্রমুখাৎ তাঁহার আজ্ঞা পাইলেই একেবারে আপনাদের দাতব্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতেন। যে কোন হিন্দু এ বিষয়ে প্রবঞ্চনা করিত, তাহাকে সপরিবারে মুসলমান করা যাইত। কিন্তু রাজকরগ্রাহি তাঁহার ভৃত্য সকল তাঁহার জ্ঞাতসারে কিম্বা

অজ্ঞাতসারে প্রজাদের উপরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেন। বিশেষতঃ নাজির আহম্মদ নামে এক জন বিলম্বকারি জমীদারদিগকে অশেষ প্রকার যন্ত্রণাদ্বারা শারীরিক ক্লেশ দিতেন। এবং নবাবের দৌহিত্রীর পতি সায়দ রেজা খাঁ নামে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ক্রূর ছিলেন, তিনি রাজকরের আদায় বিষয়ে সকলকে ভয় দেখাওনার্থে এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া মূত্রাদি ঘৃণাহ মলেতে পূরাইয়া যে জমীদার কর দিতে ত্রুটি করেন, তাঁহার গলায় রজ্জু দিয়া তাঁহাকে সেই স্থান দিয়া টানাটানি করিতে আজ্ঞা করিতেন, এবং পরিহাস পূর্ব্বক সেই শাস্তির নাম বৈকুণ্ঠ মাত্র রাখিতেন।

মুরশীদ কুলি খাঁ সপ্তাহে দুই দিন বিচার করিতেন, এবং তাঁহার বিচারাজ্ঞা পক্ষপাতরহিত হওয়াতে তাঁহার সুখ্যাতিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইল। তিনি যাবজ্জীবন এক মাত্র ভার্য্যাতে আসক্ত ছিলেন, এবং পুরীমধ্যে নপুংসক রাখিতেন না। এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা যত্নপূর্ব্বক করিতেন, এবং ধান্যাদি শস্য দেশান্তরে লইয়া যাইতে কাহাকে দিতেন না। তিনি আপনি মুসলমানদের শাস্ত্রবিদ্যাতে তৎপর ছিলেন, এবং বিদ্বান লোকদের প্রতি অনুগ্রহ এবং সর্ব্বসাধারণের প্রতি দাতৃত্ব প্রকাশ করিতেন। তিনি অতি পরিমিত ভোগী হওয়াতে সামান্য দ্রব্য আহার করিতেন, এবং অনাবশ্যক সুখভোগে তাঁহার রুচি হইত না, কেবল আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে ষোলো আনা মন দিয়া যত্ন করিতেন।

১৭২৪ শালে তিনি মৃত্যু নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সুদৃশ্যরূপে নিজ কবরস্থান প্রস্তুত করিলেন; এবং আপন দৌহিত্র সের ফরাজ খাঁকে আপন পদে নিযুক্ত করিতে অতি

যত্নবান হইলেন। কিন্তু উক্ত যুবলোকের পিতা সুজা উদ্দীন নামক উড়িষ্যা দেশের শাসনকর্ত্তা শ্বশুরের সেই যত্ন নিরর্থক করিয়া আপনি সুবাদারের কর্ম্ম পাইতে উদ্যোগ করিলেন। এবং দিল্লীর এক প্রধান রাজমন্ত্রী সেই ব্যক্তির বন্ধু হওয়াতে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন, যেহেতুক মুরশীদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার পদ পাইবেন, বাদশাহ ঐ মন্ত্রির অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেন। ১৭২৫ শালে মুরশীদ প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি চৌবিশ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ের মধ্যে আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত দেশে তাঁহা অপেক্ষা প্রধান কেহ ছিল না। সুজা উদ্দীন পূর্ব্বে দূতগণকে মুরশীদাবাদে পাঠাইয়া প্রতিদিন পত্রদ্বারা নবাবের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, পরে তাঁহার বাঁচিবার আর কোন প্রত্যাশা নাই, ইহা শুনিয়া সেই নগরে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নবাবের মৃত্যুর সম্বাদ এবং যাহাদ্বারা তিনি আপনি তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হন, এমন রাজাজ্ঞাপত্র পাইয়া আরও ত্বরায় যাত্রা করিয়া অবিলম্বে মুরশীদাবাদে পঁহুছিলেন। তাঁহার আগমন সময়ে তাঁহার পুত্র গদী অধিকার করিতে উদ্যত ছিলেন, কিন্তু দিল্লীর রাজসভা আমার পিতার সাহায্য করিতেছে, ইহা দেখিয়া ঐ পদপ্রাপ্তির চেষ্টাহইতে নিবৃত্ত হইলেন, তাহাতে সুজা উদ্দীন ১৭২৫ শালে বঙ্গদেশের নাজিম ও দেওয়ান হইলেন। মুরশীদ কুলি খাঁ ইংরাজদের বিষয়ে সর্ব্বদা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া অনেক বার তাঁহাদের যত্ন বিফল করিলেও তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুদ্বারা অতি শোকান্বিত হইলেন, ইহা কোর্ট আফ ডাইরেক্টরের নিকটে লিখিত তাঁহাদের পত্রদ্বারা প্রকাশ পায়।

৮ অধ্যায়।

সুজা উদ্দীন খোরাসানদেশীয় তুরুকবংশোদ্ভব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম দেকান দেশের বুরহানপুরে হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে মুরশীদ কুলিখাঁর সহিত সৌহার্দ্য করাতে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন; এবং মুরশীদ যখন বঙ্গদেশের দেওয়ান হইলেন, তখন জামাতাকে নিজ নায়েবরূপে উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। অল্প কাল পরে মিরজা মুরশীদ নামক সুজার কোন কুটুম্ব আপন দুই পুত্রের সহিত সুজার নিকটে আইলেন। সেই দুই পুত্রের মধ্যে একের নাম হাজি আহমদ ও দ্বিতীয়ের নাম মিরজা মুহম্মদ আলি। তাঁহারা উভয়ে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইলেন, বিশেষতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তি আলি বার্দ্দি খাঁ এই নূতন নাম লইয়া মুরশীদ কুলি খাঁর মৃত্যুর পোনেরো বৎসর পরে রাজকীয় শক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ঐ সুজাদ্বারা উচ্চপদান্বিত হইলে তাঁহাদের কৌশলে সুজা সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইলেন।

বাদশাহের কোন ভৃত্য যে ধন সঞ্চয় করে, তাহা তাহার মৃত্যুর পরে বাদশাহের হয়. মোগলরাজ্যে এই নিয়ম চলিত হওয়াতে শাহ সুজা আপন শ্বশুরের অর্থাৎ মৃত সুবাদারের সমস্ত সম্পত্তি আটক করিয়া তাহার মধ্যে একষট্টি লক্ষ টাকা দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন, এবং বোধ হয় তত্তুল্য ধন আপনার জন্যে রাখিলেন। এমত উপঢৌকন পাইয়া বাদশাহ তাঁহাকে বাঞ্ছিত উচ্চপদ দিলেন। তথাপি বেহার দেশের শাসন করিতে অন্য এক জনকে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর সুজা নিজ পুত্র সের্ ফরাজ খাঁকে বঙ্গদেশের দেওয়ান করিলেন, এবং রায় আলম চাঁদ

নামক এক হিন্দুকে রায়রায়ণ উপাধি দিয়া তাঁহার নায়েব করিলেন। এবং গুরুতর বিষয়ে মন্ত্রণা করণের নিমিত্তে উক্ত দুই জন ভ্রাতা হাজি আহমদ ও মিরজা মুহম্মদ আলি, এবং আলম চাঁদ ও বাদশাহের বণিক জগৎশেট, এই চারি জনকে মন্ত্রী করিয়া রাজসভাসদ করিলেন। অধিকারের আরম্ভ সময়ে তিনি দয়া প্রকাশ করিয়া যে সকল জমীদার বাকী প্রযুক্ত পূর্ব্বগত সুবাদারদ্বারা কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন; এবং যদ্যপি এই রূপ মৃদুতা দেখাইলেন, তথাপি প্রথম বৎসরে বঙ্গদেশের ও উড়িষ্যার এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকা পরিমিত রাজকর দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন, এমত জনশ্রুতি আছে, কিন্তু বোধ হয় তাহার মধ্যে তাঁহার মৃত শ্বশুরের সঞ্চিত ছিল।

১৭২৬ শালে অর্থাৎ মুরশীদের মৃত্যুর এক বৎসর পরে মান্দ্রাজের আদালতের ন্যায় কলিকাতায় মেয়রের অর্থাৎ নগরাধ্যক্ষের আদালত স্থাপিত হইল, তাহাতে যে নগরাধ্যক্ষ ও অলডরমেন অর্থাৎ মণ্ডলগণ ছিলেন, তাঁহারা সকলে ইংরাজ লোক ছিলেন। তাহার কএক বৎসর পূর্ব্বে যখন তদ্রূপ আদালত মান্দ্রাজে স্থাপিত হইয়াছিল, তৎকালে কতিপয় তদ্দেশীয় ও পর্ত্তুগীস ও আর্ম্মাণী লোককে তাহাতে নিযুক্ত করিতে কোর্ট আফ ডাইরেক্টরের আজ্ঞা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক জনও সম্মত হইল না। উক্ত আদালতের বিচারাজ্ঞা যেন বিলম্ব প্রযুক্ত ঘৃণার্হ না হয়, এই নিমিত্তে সহজ নিয়মানুসারে শীঘ্র বিচার করিতে হইবে, ডাইরেক্টরগণ এমত আদেশ ইংলণ্ড হইতে পাঠাইলেন।

সুজা উদ্দীন আপন অগ্রগামি সুবাদারের ন্যায় পরি-

মিতভোগী ছিলেন না, কিন্তু আড়ম্বরীতে ও সুখভোগে রত ছিলেন। এবং মুরশীদ কুলি খাঁর প্রাসাদ ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া অতি শোভান্বিত এক নূতন পুরী নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং পূর্ব্বকালের পাঁচ সহস্র সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া পঁচিশ সহস্র করিলেন, তথাপি পূর্ব্ববৎ তিন জনের মধ্যে এক জন অশ্বারূঢ়, অন্য দুই জন পদাতিক সৈন্য ছিল; এবং তাঁহার অধিকারের আরম্ভসময়ে প্রজারা তাঁহার সুবিচার ও দয়া দেখিয়া তাঁহাকে সৌভাগ্যের যোগ্যপাত্ররূপে জ্ঞান করিল।

তাঁহার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে বেহারের সুবাদার কোন অপরাধ প্রযুক্ত পদচ্যুত হওয়াতে পুনরায় বঙ্গদেশের সহিত সেই সুবার সংযোগ হইলে সুজা উদ্দীন আপন পুত্র সের ফরাজ খাঁকে তাহা দিতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা পুত্রের বিচ্ছেদ অসহ্য জ্ঞান করাতে পূর্ব্বোক্ত মিরজা মুহম্মদ আলি (অর্থাৎ আলি বর্দ্দি খাঁ) সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন, যেহেতুক সভাস্থদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি ১৭৪০ শাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ এগারো বৎসর পর্য্যন্ত সেই দেশে কর্ত্তৃত্ব করিলেন। পাটনায় আগমনকালে তিনি রাজকীয় কর্ম্মের গোলযোগ ও জমীদারগণের অবাধ্যতা এবং দস্যুগণদ্বারা সমস্ত দেশের লুটপাট দেখিয়া এক দল পাঠান সৈন্যকে ও আবদুল করীম খাঁ নামক তাহাদের অতিসাহসি সেনাপতিকে বেতন দিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাদের সহিত আপনার আনীত সৈন্যকে মিলাইয়া তাহাদের দ্বারা দেশের সুনিয়ম করিলেন, এবং জমীদারগণের নিকটহইতে বলপূর্ব্বক অনেক অর্থ লইয়া সৈন্যদিগকে দিলেন। পরে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া উক্ত আবদুল করীম খাঁর অহঙ্কারে বি-

রক্ত হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। তাহাতে তত্রাস্থ লোক সকল অতি ভীত হওয়াতে তাঁহার শক্তি অতি দৃঢ় হইল, এমত জনশ্রুতি আছে।

তৎকালে হলণ্ড দেশের পার্শ্বস্থিত যে অঞ্চল অষ্ট্রিয়া রাজ্যের অধীন ছিল, তন্নিবাসি বণিক লোক সকল ভারতবর্ষের বাণিজ্যদ্বারা ধনলাভ করিতে উৎসুক হওয়াতে জর্ম্মাণিদেশীয় রাজাধিরাজের অনুমতিদ্বারা অস্টেণ্ড নগরীয় ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে কতিপয় জাহাজ পাঠাইয়া বহুলাভজনক বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ইংরাজ ও ওলন্দাজ লোকেরা ঈর্ষ্যা প্রযুক্ত সেখান হইতে তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে যত্নবান হইলেন। তাহাতে ঐ বণিকেরা চন্দননগরের অপরপারে স্থিত বাঁকী বাজার নামক স্থানের অধিকারী হইয়া দুর্গাদিদ্বারা তাহা সুরক্ষিত করিয়াও ১৭৩৩ শালে বঙ্গদেশহইতে তাড়িত হইলেন, এবং তাঁহাদের দুর্গ ভগ্ন হইয়া সমভূমি হইল।

সুজা উদ্দীন আপন জামাতা মুরশীদ কুলিকে ঢাকা অঞ্চলের নায়েব নাজিম করিলে তিনি পারসদেশের শিরাজ নগরে জাত মীর হবীব নামক এক ব্যক্তিকে তথাকার দেওয়ান করিয়াছিলেন। উক্ত মীর হবীব হুগলীতে দালালী কর্ম্ম করিতেন, এবং যদ্যপি অক্ষর জানিলেন না, তথাপি তাঁহার অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। ঢাকাতে তাঁহার আগমনের পরে ত্রিপুরার স্বাধীন রাজার ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের কোন কর্ম্মেতে বিরক্ত হইয়া এক জন মুসলমান জমীদারের নিকটে আশ্রয় লইলেন, এবং সেই জমীদার মীর হবীবের নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিলে মীর হবীব সেই বিবাদকে ত্রিপুরা দেশ লইবার সুযোগ বুঝিয়া রাজার অজ্ঞাতসারে সৈন্যসামন্তের সহিত

ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে রাজা পর্ব্বতময় দেশে পলাইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজত্ব পাইয়া আপন বার্ষিক রাজকরের অধিকাংশ বঙ্গদেশের সুবাদারকে দিতে স্বীকার করাতে সেই ত্রিপুরার রাজ্য অতি পূর্ব্বকালাবধি স্বাধীন হইয়াও তদবধি মুসলমান রাজ্যে যুক্ত হইল।

পরবৎসরে মুরশীদ কুলি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হইলেন; এবং সেই বুদ্ধিমান মীর হবীব তথাকার দেওয়ান হইয়া তাঁহার সঙ্গে গেলেন। উঁহার যত্নদ্বারা সেই দেশের চাষ কাম ও রাজস্বের বৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বগত নায়েব নাজিমের কোন কর্ম্মে খুরদার রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া জগন্নাথের বিগ্রহকে চিল্কা হ্রদের ওপারে উড়িষ্যার সীমার বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিবৎসর যে নয় লক্ষ টাকার কর যাত্রিকগণের নিকটে সংগৃহীত হইত, তাহা আর লব্ধ না হওয়াতে রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল. এই নিমিত্তে মুরশীদ কুলি ও তাঁহার দেওয়ান উড়িষ্যাতে আগত হইবা অবিলম্বে ঐ বিগ্রহ ফিরিয়া আনিয়া পূর্ব্ববৎ পুরীতে স্থাপন করিতে রাজাকে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে রাজা ভীত হইয়া তাহা করিলে যাত্রিকগণ পূর্ব্বের ন্যায় তথায় আসাতে ঐ কর পুনরায় লব্ধ হইতে লাগিল।

মুরশীদ কুলি উড়িষ্যা দেশে নিযুক্ত হইলে সুজা উদ্দীন আপন পুত্র সের্ফরাজ খাঁকে ঢাকার কর্ত্তৃত্বপদ দিলেন, কিন্তু তাঁহাকে তথায় না পাঠাইয়া ঘালিব আলিকে তাঁহার নায়েব ও যশোবন্ত রায়কে তদ্দেশের দেওয়ান করিলেন। উক্ত যশোবন্ত রায় পূর্ব্বগত নাজিম মুরশীদ কুলি খাঁর নিকটে কর্ম্ম শিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক ও দানশীল ও কর্ম্মেতে যত্নবান ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার

কুব্যবহার নিবারণ করিয়া আপনার অধীন দেশ উত্তমরূপে শাসন করাতে প্রজাদিগকে ধনযুক্ত ও সুখী করিলেন. এবং পক্ষপাত বিনা বিচার করিতেন, তাহাতে দেশের সমস্ত লোক যশোবন্ত রায়ের ও তাঁহার প্রভুর গুণগান করিতেন। পূর্ব্বে যে শাইস্ত খাঁ নামক বঙ্গদেশের নবাব ঢাকা রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকার সময়ে টাকায় আট মোন চাউল বিক্রয় হওয়াতে তিনি শস্যের এই সুলভ্যতার স্মরণার্থে ঢাকা ত্যাগ করণসময়ে নগরের যে দ্বার দিয়া বহির্গত হন, তাহা ইষ্টকদ্বারা রুদ্ধ করিয়া যে অবধি শস্য তদ্রূপ সুলভ্য না হয়, তাবৎ সেই দ্বার দিয়া গমনাগমন করিতে সকলকে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি; যশোবন্ত রায় শস্য আরও সুলভ্য করাতে সেই নগরদ্বার সর্ব্বসাধারণের গমনাগমনার্থে পুনরায় খুলিয়া দিলেন। পরে সুজা উদ্দীন সুবাদার বৃদ্ধ হওয়াতে আপনি কর্ম্মে আর বড় মনোযোগ করিলেন না, তাহাতে তাঁহার পুত্র সের ফরাজের উপর কর্ম্মের ভার হওয়াতে তিনি অবিবেচনা প্রযুক্ত গালিব আলিকে ঢাকা হইতে আহ্বান করিয়া মুরাদ আলি নামক আপনার এক যুব কুটুম্বকে তথাকার নায়েব নাজিম করিলেন, এবং সেই ব্যক্তি রাজবল্লভ নামক এক জনকে সঙ্গে লইয়া আপন পেস্কার করিলেন। তাঁহারা প্রথমাবধি অতিশয় দৌরাত্ম্য প্রকাশ করাতে যশোবন্ত রায় বিরক্ত হইয়া আপন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুরশীদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহাতে কাহারো দ্বারা মুরাদ আলি ও রাজবল্লভের দমন না হওয়াতে তাঁহারা প্রজাদিগের প্রতি তাবৎ প্রকার উপদ্রব করিয়া অল্পকালের মধ্যে দেশ দুর্দ্দশাপন্ন করিলেন।

সুজা উদ্দীনের অধিকার সময়ে পরদেশীয়দের অর্থাৎ ইংরাজ ও ফরাসি ও ওলন্দাজ লোকদের বাসস্থান নিষ্কণ্টকে থাকিয়া ধনেতে বর্দ্ধিষ্ণু হইল। তাঁহারা বাদশাহের ও পূর্ব্বগত সুবাদারগণের অনুগ্রহেতে যে সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে নবাব কোন বাধা করিতেন না। কেবল একবার তাঁহাদের সঙ্গে বিবাদ হইল। হুগলীর ফৌজদার ইংরাজদের একখান রেসমের নৌকা আটক করাতে তাঁহারা এক দল পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া তাহা উদ্ধার করিলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহারা নবাবের নিকটে অতি অপরাধিরূপে অপবাদিত হইলে তিনি কলিকাতা প্রভৃতি তাঁহাদের কারখানাতে শস্য আনিতে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে নিষেধ করিলেন, তাহাতে অধিক মুদ্রার উপঢৌকনদ্বারা তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিতে ইংরাজদের আবশ্যক হইল। ঐ সময়ে ইংরাজদের বাণিজ্য অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইলেও তাঁহারা সুবিচার পূর্ব্বক তাহার নির্ব্বাহ না করাতে বৎসরে শতকরা আট মুদ্রামাত্র লাভ পাইতেন, কিন্তু ওলন্দাজ লোকেরা আপন বাণিজ্যদ্বারা শতকরা পঁচিশ মুদ্রা পাইতেন। ইংরাজ কোম্পানির অধ্যক্ষেরা আপন ২ লাভার্থ বাণিজ্য করিতে ব্যস্ত হওয়াতে কর্ত্তাদের লাভের বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেন না। কলিকাতাস্থিত উচ্চপদান্বিত সাহেবদের মাসিক বেতন তিন শত টাকামাত্র ছিল, তথাপি তাহারা সকলে অতিশয় সুখভোগে কালযাপন করিতেন, যেহেতুক তাঁহাদের নিজ বাণিজ্যদ্বারা অনেক অর্থ লাভ হইত। তৎকালে সর্ব্বপ্রধান সাহেব ছয় অশ্বের রথে আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন, কেবল তিনি তাহা করিতেন এমন নয়, তাঁহার অধীন কোন ২ সাহেব তাহাই করিতেন, এবং ভোজনের

সময়ে বাদা করণার্থে বাদাকরগণ রাখিতেন। অতএব এই সুখভোগের বিষয়ে পত্রদ্বারা আপনাদের ভৃত্যগণকে তিরস্কার করিতে কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স আবশ্যক জ্ঞান করিলেন। তৎকালে ১৭৩০ শাল অবধি ১৭৪২ শাল পর্য্যন্ত ডুপ্লে সাহেব নামে অতি জ্ঞানবান এক ব্যক্তি ফরাসি লোকদের চন্দননগরের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে আপনি মহৎ বাণিজ্য করাতে সেই স্থানের বাণিজ্য অধিকের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, যেহেতুক তিনি আপনার নিজে জাহাজ ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরস্থ সর্ব্বস্থানে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার অধিকার সময়ে চন্দননগর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোজ্ঞ হইল এবং দুই সহস্র ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইল, এবং ফরাসি লোকদের সমাদর বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থানে হইতে লাগিল।

১৭৩৭ শালের ১১ আক্টোবর রাত্রিকালে ভাগীরথীর মুহানার নিকট অতিভয়ানক ঝড় হইল, তাহাদ্বারা নদীর শত ক্রোশ পর্য্যন্ত অনেক ক্ষতি জন্মিল, বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ লোকদের অতিশয় ক্লেশ হইল, যেহেতুক ঝড়ের সহিত প্রবল ভূমিকম্প হওয়াতে নগরের দুই শত ঘর নষ্ট হইল, এবং গির্জ্জার অতি সুন্দর চূড়া ভগ্ন না হইয়া একেবারে দহমধ্যে মগ্ন হইল, এবং ছোট বড় সর্ব্বশুদ্ধ বিংশতি সহস্র নৌকা ভগ্ন হইল এমন জনশ্রুতি আছে; তৎকালে ইংরাজদের যে নয় জাহাজ নদীতে ছিল তাহার মধ্যে আটখান নাবিক লোকের সহিত ডুবিয়া গেল, এবং দুই সহস্র মোন ধরে এমত কোন ২ নৌকা বৃক্ষগণের উপরিভাগ দিয়া চালিত হইয়া নদীকূলহইতে এক ক্রোশ দূরে ভূমিতে বসিল। বোধ হয় তৎকালে তিন লক্ষ মনুষ্য মরিয়া গেল, এবং নদীর জল স্বাভাবিক অবস্থা-

হইতে সাতাইশ হস্ত উচ্চ হইল। এই সকল দুঃখভোগান-ন্তর পরবৎসরে দুর্ভিক্ষ হইল। কলিকাতার শাসনকর্ত্তা এতদ্দেশীয় দরিদ্র প্রজাদিগের উপকার করিতে যত্নবান হইয়া অনেক দাতৃত্ব প্রকাশ করিলেন ও তাহাদের রাজ-কর ক্ষমা করিলেন ও ঋণ দিলেন ও চাউলের মাসূল নি-বৃত্ত করিলেন এবং কোম্পানির ভাণ্ডারহইতে অর্থ লইয়া বহু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিলেন।

সুজা উদ্দীন চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত সুখেতে রাজত্ব করি-লেন। তিনি যথার্থ বিচার ও দয়া ও দাতৃত্ব প্রযুক্ত সুপ্রতি-ষ্ঠিত হইলেন। শেষে তিনি যত লোকের বিষয়ে এমত বোধ করিলেন যে আমি ইহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াছি, সেই সকলের নিকটে মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ক্ষমা প্রার্থনা করণার্থে লোক পাঠাইলেন। তিনি প্রতিবৎসর নিয়মিত সময়ে এক কোটিহইতে অধিক টাকা রাজকর দিল্লীতে প্রেরণ করিতেন, এই কারণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উচ্চপদে স্থির থাকিলেন। শেষে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া আপন পুত্র সের ফরাজ খাঁকে আহ্বান করিলেন। এবং আমি হাজি আহমদ ও জগৎ সেট ও রায়রায়ণ এই কএক জনের পরামর্শ গ্রাহ্য করিব, তাহাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া দেশের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। যে অবধি মোগল লোকেরা দেশ জয় করিয়াছিল, তদবধি বঙ্গদে-শের অন্য কোন শাসনকর্ত্তা আপনার উত্তরাধিকারিকে আপনি নিযুক্ত করেন নাই। কিন্তু তৎকালে পারস দেশীয় নাদীর শাহ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের আক্রমণদ্বারা মোগলরাজ্য সমূলে কম্পিত হওয়াতে বাদশাহ নিকটবর্ত্তি কর্ম্মের ভার প্রযুক্ত দূরস্থ প্রদেশের কর্ম্মে মনোযোগ করিতে পা-রিলেন না।

১৭৩৯ শালে সুজা উদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সের ফরাজ খাঁ নির্ব্বাধায় কর্ত্তৃত্ব পাইয়া স্বপদে নিযুক্ত হওনার্থে দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিলেন। তৎকালে নাদীর শাহ ঐ বিপদগ্রস্ত নগর জয় করিয়াছিলেন, পরে বঙ্গদেশের অবশিষ্ট রাজকর চাহিবার নিমিত্তে সুজা উদ্দীনের নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠাইলে সের ফরাজ খাঁ পত্র পাইবামাত্র মুদ্রাতে বিজয়ি নাদীর শাহের নাম অঙ্কিত করিয়া রাজকর প্রেরণ করিলেন। তিনি পিতার আদেশানুসারে রায় আলম চাঁদ ও জগৎ সেট ও হাজি আহমদ এই কএক জন মন্ত্রিগণকে রাখিলেন, কিন্তু আপনি কর্ম্ম অপেক্ষা সুখভোগে অধিক রত হইলেন। তৎকালে হাজি আহমদের ভ্রাতা আলি বর্দ্দি খাঁ বেহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং শুবাদারের অধীন তিন প্রদেশের মধ্যে আলি বর্দ্দি খাঁর ন্যায় ক্ষমতাপন্ন আর কেহ ছিল না। এমন হইলেও শুবাদার উক্ত হাজির ও তাঁহার বংশের বিদ্বেষি তিন জন ভদ্র লোককে আপন বিশ্বাসপাত্র করিলে তাঁহারা সর্ব্বদা ঐ হাজির বিনাশ করিতে চেষ্টান্বিত হইয়া কুমন্ত্রণাদ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে নিজ প্রভুর ক্রোধ জন্মাইলেন। তাহাতে আলি বর্দ্দি ও তাঁহার বংশ যে শুবাদারের অপ্রিয়পাত্র হইলেন, ইহা তাঁহার আচরণদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। সের ফরাজ খাঁ যথাসাধ্য হাজিকে বিরক্ত করিতে যত্ন করিতেন, এবং তিনি সর্ব্বদা পত্রদ্বারা তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত পাটনায় ভ্রাতার নিকটে জানাইতেন। সেই সময়ে জগৎ সেটও শুবাদারের আচরণে অসন্তুষ্ট হইলেন, যেহেতুক এক দিন কামেচ্ছুক সের ফরাজ খাঁ জগৎ সেটের পরমসুন্দরী পুত্রবধূকে দেখিতে মনস্থ করিলেন, তাহাতে সেই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সমস্ত পরিবার শুবাদারের শত্রু হইয়া উঠিল।

শেষে তিনি হাজি আহ্মদের পরিবারমধ্যে এক বিবাহ ভঙ্গ করিয়া বাগ্‌দত্তা কন্যাকে আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলে সের ফরাজকে পদচ্যুত করণের পরামর্শ স্থির হইল। ফলতঃ তিনি যাবৎ সুবাদার থাকিবেন, তাবৎ আমার অন্তরঙ্গ সকল নির্ভয়ে কালযাপন করিতে পারিবেন না, ইহা বুঝিয়া আলি বর্দ্দি খাঁ আপনি সেই পদে নিযুক্ত হইতে দিল্লীতে নিজ বন্ধুদ্বারা চেষ্টা করিলেন, এবং বার্ষিক রাজকর ব্যতিরেকে এক কোটি টাকা ও সের ফরাজের সমস্ত ধন তথায় পাঠাইতে অঙ্গীকার করিলেন। তাহাতে নাদীর শাহের ভারতবর্ষ ত্যাগ করণের পরে দশ মাস গত হইলে, অর্থাৎ সুজা উদ্দীনের মৃত্যুর তেরো মাস পরে তিনি বাদশাহের সনন্দ পাইয়া ভোজপুরে যুদ্ধযাত্রা করণের ছলে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। সেই সৈন্যসামন্তের সহিত কিয়ৎ দূরে গেলে পরে তিনি আপন সৈন্যাধিপতি সকলকে সভাস্থ করিয়া মুসলমানদিগকে কোরাণ স্পর্শদ্বারা ও হিন্দুদিগকে গঙ্গা জল স্পর্শদ্বারা অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ধনে প্রাণে আপনার পক্ষে থাকিতে শপথ করাইলেন। এই রূপ দিব্য হইলে পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার পরিবারের যে অপমান হইয়াছে তাহার প্রতিফল দিতে আমি মুরশীদাবাদে যাইতেছি। পরে তিনি তৎক্ষণাৎ বঙ্গদেশের দিগে যাইতে আপন সৈন্যগণকে আজ্ঞা করিলেন। এবং সেই সময়ে সুবাদারকে ইহা লিখিলেন, আমি অপমানগ্রস্ত আপন পরিবারকে স্থানান্তরে লইবার নিমিত্তে আসিতেছি, তথাপি আপনকার আজ্ঞাবহ প্রজা আছি। আলি বর্দ্দি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করণার্থে আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া সের ফরাজ চমৎকৃত হইলেন, পরে অনেক বিলম্বপূর্ব্বক সৈন্য

সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রাজধানীর নিকটবর্ত্তি গেরিয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত গমন করিলেন। আলি বর্দ্দি খাঁ অগ্রসর হইতেং পুনঃ২ পত্রদ্বারা তাঁহাকে ইহা জানাইলেন, যদি আপনি চারি পাঁচ জন অমাত্য বিদায় করেন, তবে আমি আপনকার অতি বশীভূত প্রজা হইব। যে রাজা অস্ত্রধারি প্রজার আজ্ঞা মানে সে রাজত্ব ত্যাগ করে, তথাপি সের ফরাজ খাঁ ভয়েতে ঐ রাজদ্রোহাচারি ব্যক্তির কথা শুনিতে অসম্মত ছিলেন না, এমন বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার ঐ নূতন মন্ত্রিগণ মৃত্যুভয়ে তাহা শুনিতে তাঁহাকে দিলেন না। শেষে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে ভয়ানক সংগ্রাম হইলে সের ফরাজ এক বন্দুকের গুলিদ্বারা আহত হইয়া রণস্থলে মরিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করিলে আলি বর্দ্দি খাঁ ক্রমে২ মুরশীদাবাদে যাইয়া আপন উপকারি ব্যক্তির রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ঐ গেরিয়ার যুদ্ধ ১৭৪১ শালের জানুয়ারি মাসে হইয়াছিল।

৯ অধ্যায়।

আলি বর্দ্দি খাঁ যখন বঙ্গ ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের সুবাদার হইলেন, তখন পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক ছিলেন। বাদশাহের সনন্দদ্বারা সেই পদে নিযুক্ত হইলেও তিনি বাস্তবিক যুদ্ধদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইলেন। এবং তৎকালে নাদীর শাহের আক্রমণদ্বারা মুসলমানদের রাজ্য নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, তাহাতে যে বলহীন মহম্মদ শাহ্ দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন, তিনি যদ্যপি অন্য কোন ব্যক্তিকে সেই সুবাদারের পদ দিতে ইচ্ছুক হইতেন, তথাপি তাহা করিতে পারিতেন না। এমন সময়ে আলি বর্দ্দি খাঁ ঐ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন, ইহা বঙ্গদেশের সৌভাগ্য বলিতে

হয়, যেহেতুক তিনি বিংশতি বৎসরাবধি যুদ্ধের এবং বিরামের সময়ে রাজকীয় কর্ম্ম করাতে মন্ত্রণাতে ও যুদ্ধশক্তিতে অতি নিপুণ ছিলেন। এবং সম্প্রতি যে সময়ের বর্ণনা করিতে হয়, এমত দুঃখের সময়ে অতি নিপুণ শাসনকর্ত্তার আবশ্যক ছিল।

তিনি মুরশীদাবাদে আসিয়া সের ফরাজ খাঁর পরিবারের ও তাঁহার অনুগত লোকদের মধ্যে কাহারও প্রাণের হানি করিলেন না, বরং সকলের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিলেন। মুরশীদ কুলি খাঁ আপনার সকল দ্রব্যাদি অস্থাবর ধন মৃত্যুর পরে বাদশাহের লভ্য হইবে, ইহা জানিয়া নিজ পরিবারের উপকারার্থে কতিপয় ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া আপনার নামে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মরণানন্তর যখন তাঁহার তাবৎ অস্থাবর ধন দিল্লীতে প্রেরিত হইল, তখন সেই ভূমি সকল তাঁহার জামাতার অধিকারে রহিয়াছিল, পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী অর্থাৎ সের ফরাজের মাতা তাহা পাইয়াছিলেন। আলি বর্দ্দি তাঁহাকে সেই ভূমি পূর্ব্ববৎ ভোগ করিতে দিলেন, এবং তাঁহাকে এমত সমাদর করিতেন, যে তাঁহার অনুমতি বিনা তাঁহার সাক্ষাতে কখনো বসিতেন না। এইরূপ সুবোধপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া আপন শত্রুদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। এবং দিল্লীর রাজসভার নিকটে আপন প্রতিজ্ঞানুসারে এক কোটি টাকা প্রেরণ করিলেন, কেবল তাহা নহে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য উপঢৌকন, এবং সের ফরাজ খাঁর যে সম্পত্তি ছিল, তাহার এক বৃহৎ অংশও পাঠাইলেন, এইরূপে বাদশাহকে স্বপক্ষে রাখিলেন। তাঁহার নিজ পুত্র ছিল না, কিন্তু তিনি আপন ভ্রাতা হাজি আহমদের তিন পুত্রের সহিত

আপনার তিন কন্যার বিবাহ দিয়া সেই তিন জামাতার মধ্যে নওয়াজীশ মহম্মদ নামক জ্যেষ্ঠকে ঢাকার, এবং সৈদ উদ্দীন নামক কনিষ্ঠকে বেহারের শাসনকর্ত্তা করিলেন, এবং ঐ কনিষ্ঠের পুত্রকে সেরাজ উদ্দৌলা এই নাম দিয়া পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারী করিলেন। এবং সায়দ আহম্মদ খাঁ নামে মধ্যম ভ্রাতৃপুত্রকে উড়িষ্যাদেশের কর্তৃত্বপদ দিতে স্বীকার করিলেন; কিন্তু অগ্রে সেই উড়িষ্যাদেশ যুদ্ধদ্বারা জয় করিতে আবশ্যক হইল।

সুজা উদ্দীন উড়িষ্যা দেশের কর্তৃত্ব আপন জামাতা মুরশীদ কুলিকে দিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত অতি বুদ্ধিমান মীর হবীব মন্ত্রিরূপে তাঁহার নিকটে ছিলেন। প্রথমে মুরশীদ কুলি আলি বর্দ্দির সৌভাগ্য দেখিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা এবং বাখির আলি নামক তাঁহার সাহসী জামাতা তাহাতে অসম্মত হইয়া সের ফরাজের শত্রুকে তাঁহার মৃত্যুর প্রতিফল দিতে এবং বহুধনযুক্ত বঙ্গদেশ স্বহস্তগত করিতে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইলেন। তাহাতে তিনি যে সন্ধি করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন, তাহা ভগ্ন করিলে আলি বর্দ্দি তাহার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে উড়িষ্যা দেশ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু মুরশীদ আপন সেনাপতিগণকে ডাকাইয়া, তোমরা কি আমার পক্ষে থাকিবা? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার প্রধান সেনাপতি আবেদ আলি উত্তর করিলেন, আপনি আমাদিগকে নিতান্ত বিশ্বস্তরূপে জ্ঞান করিতে পারেন। পরে মুরশীদের সৈন্য সকল বঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রা করণার্থে বালেশ্বরের পূর্ব্বদিগে আসিয়া

অতি দুরাক্রম্য স্থানে শিবির স্থাপন করিলে আলি বর্দ্দি আপনার বারো সহস্র উত্তম সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আইলেন। তাহাতে মুরশীদ আলি যদি সুবিচার করিয়া আপনার সুরক্ষিত শিবিরমধ্যে থাকিতেন, তবে আলি বর্দ্দিকে লজ্জাপূর্ব্বক ফিরিয়া যাইতে হইত, কারণ তাঁহার খাদ্যদ্রব্যের অকুলান হইতেছিল, কিন্তু বাখির আলি আপন শ্বশুরকে যুদ্ধ করিতে অতি শক্ত পরামর্শ দেওয়াতে তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে শিবিরের বাহিরে আনীত হইল, এবং সংগ্রামের আরম্ভ হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত আবেদ আলি বিশ্বাসঘাতক হইয়া আপন প্রভুকে ত্যাগ করিয়া আলি বর্দ্দির পক্ষীয় হওয়াতে আলি বর্দ্দি সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। মুরশীদ কুলি যুদ্ধক্ষেত্রহইতে পলাইয়া সমুদ্রতীরে আইলে দৈবাৎ মৌরাষ্ট্রীয় কোন বাণিজ্যজাহাজ তথায় লঙ্গর ফেলিয়া আছে, ইহা দেখিয়া নিজ বন্ধুগণের সহিত সেই জাহাজ আরোহণ করিয়া মাসুলিপাত্তামে গেলেন। তৎকালে তাঁহার ভার্য্যা ও অন্য পরিবার ও ধন সকল কটকে থাকাতে তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যকালে তাঁহাদ্বারা উপকৃত রত্নিপুরের হিন্দুজাতীয় রাজা বিপদকালে তাঁহার প্রত্যুপকার করিলেন, ফলতঃ আলি বর্দ্দি খাঁর কটকে আসিবার পূর্ব্বে আপন সৈন্যের সহিত তথায় গিয়া উপকারি ব্যক্তির সমস্ত পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া দেকান দেশে আনাইয়া শুবাদারের হস্তহইতে রক্ষা করিলেন।

আলি বর্দ্দি দেশ শাসনের নিয়ম স্থির করণার্থে এক মাস পর্য্যন্ত কটকে অবস্থিতি করিলেন, পরে মধ্যম ভ্রাতৃপুত্র সায়দ আহম্মদকে কর্ত্তৃত্বপদ দিয়া মুরশীদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত যুবা দুষ্ট লোকের পরামর্শ

গ্রাহ্য করাতে সকল কর্ম্ম নষ্ট করিলেন। ফলতঃ কোন দুষ্টস্বভাব ফকীর তাঁহাকে নষ্ট করিয়া কুপথগামী করাতে প্রজা সকল উপক্রুত হইয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইল। এবং মেরজা বাখির ঐ প্রদেশের নিকটে থাকিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতে ২ দূতদ্বারা প্রজাদের মনকে আরও অস্থির করিলেন, তাহাতে শেষে নগরের মধ্যে উপদ্রোহ হইলে মেরজা আহূত হইলেন, তাহাতে সায়দ আহম্মদ কারাগারে বদ্ধ হইলেন, এবং উড়িষ্যা দেশ আলি বর্দ্দির অধীনতা ত্যাগ করিল।

এই বিপরীত ঘটনা শুনিয়া আলি বর্দ্দি খাঁ অতি চমৎকৃত হইলেন, এবং দেকানের শুবাদার নিজাম উলমুলক গুপ্তরূপে মেরজা বাখিরের সাহায্য করিয়া থাকিবেন, এমত অনুমান করিলেন। অতএব যে সৈন্যদ্বারা দেশ জয় করিয়াছিলেন তাহার তিনগুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে দেশের সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া যে কেহ তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে উদ্ধার করিবে, তাহাকে এক লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিলেন। পরে মহানদীর তীরে আলি বর্দ্দি ও মেরজা বাখিরের মধ্যে যুদ্ধ হইলে আলি বর্দ্দি পুনরায় জয়যুক্ত হইলেন, এবং সায়দ আহম্মদও উদ্ধৃত হইলেন। মেরজা বাখির তাঁহাকে এক শকটের উপরে বসাইয়া শুক্লবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শকটের চতুর্দ্দিগে পাঁচ শত বড়শাধারি সৈন্যকে নিযুক্ত রাখিয়া যদি যুদ্ধে পরাজয় বোধ হয়, তবে বড়শাঘাতে তাঁহাকে বধ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহারা সেই আজ্ঞানুসারে বড়শাঘাত করিল বটে, তথাপি সায়দ আহম্মদ শকটের নিম্নভাগে শয়ান হওয়াতে বিক্ষত হইলেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে

বধ করণার্থে শকটারূঢ় হইয়াছিল, এমন এক মোগল লোক হত হইল। আলি বর্দ্দি খাঁ আনন্দভাবে অশ্রুপাত করিতে২ সায়দকে গ্রহণ করিয়া মুখেতে কতক দিন আপনার নিকটে রাখিলেন, পরে তাঁহার পিতামাতার আনন্দার্থে তাঁহাকে মুরশীদাবাদে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত সৈন্যের এক অংশ ও ভারি সামগ্রী সকল পাঠাইলেন। অনন্তর উড়িষ্যা দেশের এক নূতন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিয়া আপনার পাঁচ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য ও প্রধান সেনাপতি সকলকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিয়া মৃগয়া করিতে২ স্বীয় রাজধানীর দিগে স্বচ্ছন্দে যাত্রা করিলেন

পূর্ব্বে শত২ বৎসরাবধি যেরূপ দুর্ঘটনা বঙ্গদেশে হয় নাই, এমত ভয়ানক দুর্ঘটনার উপক্রম তৎকালে হইল। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে মারহাট্টা লোকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া তদবধি চতুর্দ্দিকস্থ অনেক দেশ জয় করিয়াছিল, এবং যে সকল দেশ অধিকারে রাখিতে অপারক ছিল, তাহা পুনঃ২ লুট করিত। এই রূপে দেশের লুটপাট যেন না হয়, এই নিমিত্তে নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র রাজগণকে আপন২ রাজস্বের চতুর্থাংশ তাহাদিগকে দিতে হইল। সেই সময় পর্য্যন্ত তাহারা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে নাই, কিন্তু তৎকালাবধি তাহার প্রতি আর দয়া করিতে অসম্মত হইল। অতএব যে সময়ে আলি বর্দ্দি খাঁ আপনার অল্প সৈন্যের সহিত মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, সেই সময়ে নাগপুরের রাজা রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন পঁচিশ সহস্র অশ্বারূঢ় মারহাট্টা সৈন্য দেশ আক্রমণ করিল। শুবাদার এমত দুর্ঘটনা

নিবারণ করিতে অপারক ছিলেন, যেহেতুক তিনি আপন সৈন্যের একাংশ বিদায় করিয়াছিলেন, এবং অন্য এক অংশ মুরশীদাবাদে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কেবল দুই তিন সহস্র অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য তাঁহার নিকটে ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন শিবির ভঙ্গ করিয়া ত্বরায় বর্দ্ধমানে গমন করিলেন, কিন্তু যে সময়ে তিনি এক দিগে ঐ স্থানের নিকটে আসিতেছেন, সেই সময়ে মারহাট্টা লোকেরা অন্য দিগে উপস্থিত হইয়া নগরে অগ্নি লাগাইলেন। পরে তাঁহাদের সেনাপতি দূত পাঠাইয়া আলি বর্দ্দিকে কহিলেন, আমাকে দশ লক্ষ টাকা দেও, তাহা দিলে আমি ঘরে যাইব। কিন্তু সুবাদার এই রূপ সন্ধি অপমানজনক জ্ঞান করিয়া আপনার অল্প সৈন্য রচনা করিয়া মারহাট্টাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্র ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার তাম্বু ও সামগ্রী সকল লইলেন। সেই যুদ্ধে তিনি আপনি সৈন্যগণহইতে পৃথক হইলেন, এবং রাত্রিতে তাঁহাকে অল্প সহচরের সহিত ক্ষেত্রে বিশ্রাম করিতে হইল। তাঁহার নিজ সেনাপতিগণ সেই দিনে তাঁহার উপযুক্ত সাহায্য না করাতে তিনি তাঁহাদের বিশ্বস্ততার বিষয়ে সন্দেহ করিয়া পরদিনে মারহাট্টা লোকদের নিকটে দূত পাঠাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত সেই দূতকে কহিলেন, তোমার প্রভুর সমস্ত দ্রব্য হারাণ হইয়াছে, এবং তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতি সকলে অসন্তুষ্ট আছেন, আমার হস্তহইতে উদ্ধার পাওয়া তাঁহার অসাধ্য; কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান নৃপতি, অতএব যদি আমাকে এক কোটি টাকা ও সমস্ত হস্তী দেন, তবে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব। তাঁহার এই নির্লজ্জ বাক্যেতে আলি

বর্দ্দি ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, যাবৎ আমার এই দেহে প্রাণ থাকে, তাবৎ আমি এমত অপমানের কর্ম্ম করিব না। কিন্তু তিনি প্রায় নিরুপায় ছিলেন, যেহেতুক তাঁহার শত২ সৈন্য শত্রুর পক্ষে যাইতেছিল, এবং তাঁহার সেনাপতিগণ অসন্তুষ্ট হওয়াতে মারহাট্টাদের সহিত সন্ধি করিতে যত্ন করিতেছিলেন। অতএব প্রবল বায়ুর সময়ে যেমন নল নত হইয়া রক্ষা পায়, তদ্রূপ আলি বর্দ্দি তৎকালে নম্র হইয়া ঘোর রাত্রির সময়ে বালক দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলার হস্ত ধরিয়া কেবল তাঁহার সহিত আপনার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মুস্তাফা খাঁর তাম্বুতে চলিলেন, এবং তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে মিত্র, শুন, তুমি আমাতে বিরক্ত হইয়াছ, তাহা আমি জানি। যদি আমার প্রাণনাশ চাহ, তবে আমাকে বধ কর, এবং আমাকে ও আমার এই দৌহিত্রকে একেবারে নষ্ট করিয়া ভয়হইতে মুক্ত হও। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বকালীয় আত্মীয়তা যদি স্মরণে থাকে, তবে আইস আমরা পুনরায় মিলিত হইয়া মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করি। পরে মুস্তাফা অসন্তুষ্ট সেনাপতি সকলকে ডাকাইলে সকলে শপথ পূর্ব্বক মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন প্রভুর পক্ষে থাকিতে অঙ্গীকার করিলেন। পরদিবসে আলি বর্দ্দি শত্রুদের মধ্যদিয়া পথ করিয়া কাঁটোয়ায় যাইতে মনস্থ করাতে তিনি ও তাঁহার লোকেরা সমস্ত দিন যুদ্ধ করিতে২ অল্পে২ অগ্রসর হইলেন। রাত্রিতে মারহাট্টা লোকেরা তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করাতে মীর হবীব ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহাদের হস্তগত হইলেন, এবং আলি বর্দ্দির প্রতি তাঁহার অতিশয় শত্রুভাব হওয়াতে তিনি মারহাট্টাদের সেনাপতি হইয়া কএক বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের

ক্লেশজনক দণ্ডস্বরূপ হইলেন। সুবাদারের সৈন্যগণ কষ্টে একত্র থাকিয়া পরদিনে অনবরত যুদ্ধ করিতে২ অগ্রসর হইলেন; তাঁহাদের তাম্বু ও বস্ত্র ও কামান ও খাদ্য কিছুই ছিল না, এবং রাত্রিতে যখন শত্রুভয়ে বিশ্রাম করিতে তাঁহাদের সাধ্য হইত, তখন বৃক্ষের তলে শয়ন করিতেন; কিন্তু শত্রুগণকর্তৃক দিবারাত্রি বেষ্টিত হওয়াতে বিশ্রাম পাইতে প্রায় পারিতেন না। বৃক্ষের পত্র ও মূল তাঁহাদের আহার ছিল, এবং সাত কত প্রধান লোকের মধ্যে তিন পোয়া চাউল বিভক্ত হইলে তাঁহারা আপনাদের সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। শেষে যে কাঁটোয়া নগরে তাঁহারা বিশ্রাম ও বাহুল্য ভক্ষ্য ভোগ করণের আশা করিয়াছিলেন, সেই নগর দেখিতে পাইলেন, কিন্তু ভাস্কর অগ্রে অশ্বারূঢ়গণদ্বারা নগর দগ্ধ ও শস্য সকল নষ্ট করিয়াছিলেন। তথাপি আলি বর্দি তথায় আসিবামাত্র মুরশীদাবাদে পত্র পাঠাইলে অবিলম্বে বাহুল্য শস্যাদি তাঁহার নিকটে আনীত হইল।

এই ক্লেশযুক্ত যাত্রার সময়ে সুবাদার যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে মারহাট্টা লোকেরা অতি চমৎকৃত হইল, এবং তিনি যদি মুসজ্জিত সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধ করেন, তবে আরও ভয়ঙ্কর হইবেন, ইহা বোধ করিল। অতএব ১৭৪২ শালের বর্ষাকাল আরম্ভ হইলে ভাস্কর পণ্ডিত আপন প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু তাঁহার নবলব্ধ সহায় মীর হবীব বঙ্গদেশ ত্যাগ করণের পূর্ব্বে আর কিঞ্চিৎ লুট প্রাপ্ত হইতে মনস্থ করিলেন। অতএব তিনি উত্তম অশ্বারূঢ় সৈন্যের মধ্যে কতক সহস্র জনকে সঙ্গে লইয়া এক দিনের মধ্যে কাঁটোয়াহইতে মুরশীদাবাদে গমন করি-

লেন, এবং আলি বর্দ্দি তাঁহার পশ্চাৎ তাড়না করিলেও মীর হবীব তাঁহার উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে উপনগর সকল লুট করিয়া এবং ঐ ধনি বণিক জগৎ সেটের গৃহ-হইতে দুই কোটি টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে মারহাট্টাদের সেনাপতি বর্ষাকালের আরম্ভ প্রযুক্ত ভীত হইয়া বীরভূমি পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু মীর হবীব তাঁহার লাগাইল পাইয়া তাঁহাকে পুনরায় কাঁটোয়াতে গমন করাইলেন, এবং সেই বর্ষাকালে মারহাট্টাদের সৈন্যাধ্যক্ষেরা কাঁটোয়াতে বাস করিলেন। তাহাতে ভাগারথীর পশ্চিমতীর আলি বর্দ্দির রাজ্যের সীমা হইল, এবং মুরশীদাবাদের নিবাসি লোকেরা ও সুবাদারের কতিপয় পরিজন আত্মরক্ষার বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া আপন সম্পত্তি গঙ্গার উত্তরপারে পাঠাইয়া দিলেন। মীর হবীব মারহাট্টাদিগকে সঙ্গে লইয়া হুগলি লুটপাট করিলেন, এবং বালেশ্বর অবধি রাজমহল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে কর গ্রহণ করিলেন। যখন তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন ইংরাজেরা আপনাদের দুর্গাদি পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন, এবং নিজ বাসস্থান সুরক্ষিত করণার্থে তাহার চতুর্দ্দিগে এক খাত খনন করিলেন। সেই খাত আর দেখা যায় না, কিন্তু মারহাট্টা পরিখা তাহার এই নাম অদ্যাপি থাকে।

অনন্তর সুবাদার মারহাট্টাদিগকে দূর করণার্থে অদ্ভুত যত্ন করিয়া নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং কামানাদি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দিল্লী-হইতে রাজদূত আসিয়া বাকী রাজকর চাহিলে আলি বর্দ্দি বাদশাহকে পত্র লিখিয়া দেশের তৃতীয়াংশ মারহাট্টাদিগের হস্তগত আছে, এবং তাহাদিগকে দমন

করণার্থে যে সৈন্যসামন্তের আবশ্যক হয় তাহার প্রতিপালন অন্য দুই অংশের করদ্বারা করিতে হয়, অতএব রীতিমতে রাজকর প্রেরণ করা আমার নিতান্ত অসাধ্য, এই কথা নিবেদন করিলেন। এবং তাঁহার কথা সত্য বটে, ইহা বাদশাহ অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হইয়া তদ্দেশের রক্ষার্থে অযোধ্যার শুবাদারকে যুদ্ধযাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু তিনি পাটনায় আসিয়া এমত স্বাত্মাভিমান দেখাইলেন, যে তাঁহার আগমন অপেক্ষা তাঁহার প্রস্থান করণেতে আলি বর্দ্দি অধিক সন্তুষ্ট হইলেন। বাদশাহ মারহাট্টাদের বালাজী রায় নামক সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির নিকটেও পত্র লিখিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে যাইয়া নাগপুরীয় মারহাট্টাদিগকে দূর করিতে পরামর্শ দিয়া কহিলেন, তাহা না করিলে আমি অন্য সকল প্রদেশের চৌত অর্থাৎ করের চতুর্থাংশ তোমাকে দিতে পারিব না।

বর্ষাকালের শেষে আলি বর্দ্দি আপন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যে স্থানে মারহাট্টা লোকদের শিবির ছিল, সেই স্থানে অর্থাৎ কাটোয়ায় গেলেন। তিনি নৌকাদ্বারা পুল প্রস্তুত করিয়া রাত্রিযোগে নদী পার হইয়া প্রভাতকালে তাহাদিকে আক্রমণ করিলেন, তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া প্রথমে পশ্চিমদিকস্থ পার্ব্বতময় দেশে, পরে মেদিনীপুরে পলায়ন করিল। তিনি তাহাদিগকে বিশ্রাম পাইতে না দিয়া প্রথমে বালেশ্বর পর্য্যন্ত, পরে চিল্কা হ্রদের ওপার পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া দেশের সীমাহইতে দূর করিলেন।

তৎকালেও তাঁহার প্রতি নূতন আপদ ঘটিল। জয়ী হইলে পরে যখন তিনি মুরশীদাবাদে আইলেন, তখন

মারহাট্টাদের অন্য দুই সৈন্যসমূহ ঐ নগরের নিকটবর্ত্তী দেশ লুটপাট করিতেছিল, যেহেতুক নাগপুরের রাজা রঘুজী আপন সেনাপতি ভাস্করের পরামর্শানুসারে দেশ আক্রমণার্থে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সেনাপতি যে সময়ে আলি বর্দ্দি খাঁর দ্বারা তাড়িত হইয়া উড়িষ্যা দেশ দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ সেনাপতির প্রভু আপনি অন্য পথে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া রাজধানীর নিকটে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং বাদশাহের নিবেদনানুসারে বাল্লাজী রায় নাগপুরীয় মারহাট্টাদিগকে দূর করণের জন্যে আইলেন, কিন্তু তাহার সাহায্য আলি বর্দ্দির ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিল। ভাগলপুরহইতে তাঁহার আগমন সময়ে আলি বর্দ্দি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। একবার বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত কথোপকথন হইলে সুবাদার রঘুজীর নিবারণার্থে আপন নূতন বন্ধুর সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু বাল্লাজী রায় বঙ্গদেশের রক্ষার্থে না আসিয়া তাহা লুট করণার্থে আসিয়াছিলেন, এই কারণ বেহার দেশের চৌত অনেক বৎসরাবধি বাকী আছে, ইহা বলিয়া সেই চৌত চাহিলেন, এবং তিনি যাহা প্রাপ্য কহিলেন, তাহা নিরুপায় সুবাদারকে শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দিতে হইল। সেই সকল মুদ্রা পাইলে পরে বাল্লাজী রায় যে অন্য মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন, এমত নহে, বরং তখনও আলি বর্দ্দিকে একাকী যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। বাল্লাজী ও সুবাদারের মধ্যে সন্ধি স্থির হইয়াছে, এই বার্ত্তা শুনিয়া রঘুজী স্থানান্তরে যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এই কারণ আলি বর্দ্দির আগমনমাত্রে শিবির ভঙ্গ করিয়া পর্ব্বতময় দেশে পলা-

হইলেন। পরে তাঁহার পলায়নের কথা শুনিয়া বাল্লাজী অবিলম্বে আপনার সেই স্বদেশীয়দের পশ্চাৎ তাড়না করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন, তাহাতে তাহাদের সমস্ত তাম্বু ও লুটিত দ্রব্য তাঁহার হস্তগত হইল, এবং তাহারা অতিশীঘ্র দেশ ত্যাগ করিয়া গেল। বাল্লাজী আপন স্বজাতীয় মারহাট্টাদিগের ধন লুট করিয়া এবং আলি বর্দ্দির নিকটে করের চতুর্থাংশ পাইয়া স্বদেশে গমনের সুসময় বুঝিয়া চলিয়া গেলেন।

১৭৪৪ সালের বর্ষাকাল গত হইলেই ভাস্কর পণ্ডিত বিংশতি সহস্র নূতন সংগৃহীত সৈন্য লইয়া পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণার্থে আইলেন। সুবাদার পূর্ব্ববৎসরে যত মুদ্রা বাল্লাজীকে দিয়াছিলেন, তত মুদ্রা তোমাকে দিতে যদি স্বীকার করেন, তবে তুমি ফিরিয়া আইস, তাঁহার প্রতি নিজ প্রভুর এমত আজ্ঞা ছিল। আলি বর্দ্দি পুনঃ২ আক্রমণ অসহ্য জ্ঞান করিয়া যদি পারি তবে বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা শত্রুকে নষ্ট করি, এইরূপ মনস্থ করিয়া সেই প্রবঞ্চনার কর্ম্মে আপন সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু সুবাদার বেহারের কর্ত্তৃত্বপদ তাঁহাকে দিতে স্বীকার করিলে শেষে সম্মত হইলেন। তাহাতে আলি বর্দ্দি সন্ধি করণের ছলে তাঁহাকে ও অন্য এক সেনাপতিকে মারহাট্টাদিগের নিকটে পাঠাইলে তাঁহারা ভাস্কর পণ্ডিতকে কহিলেন, তুমি যদি একবার সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইস, তবে তোমার প্রার্থিত সিদ্ধ হইবে। তাহাতে ভাস্কর লোভেতে মুগ্ধ হইয়া তথায় যাইতে সম্মত হইলে যে দিনে তিনি আসিবেন, সেই দিনে তাম্বুর চতুর্দ্দিগে কতক জন অস্ত্রধারী গুপ্তরূপে স্থাপিত হইল। তা-

স্কর ও তাঁহার প্রধান ভৃত্যগণ বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে সন্দিগ্ধ লোকের ন্যায় আপন২ খড়্গের বাঁটে হস্ত দিয়া আলিবর্দ্দির তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া যখন নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন আলিবর্দ্দি সিংহাসনহইতে উঠিয়া তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়দের মধ্যে কে মহাবীর ভাস্কর? তাহাতে ভাস্কর নির্দ্দিষ্ট হইবামাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, এই দস্যুদিগকে মারিয়া ফেল। তাহাতে তাহার লোকেরা তৎক্ষণাৎ খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া মারহাট্টা সেনাপতিকে ও প্রধান লোকদিগকে আঘাত করিতে লাগিল। তাঁহারা প্রাণরক্ষার্থে অতিশয় বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে পরাস্ত হইয়া প্রত্যেকে হত হইলেন। তাম্বুমধ্যে কি২ হইতেছে তাহা বুঝিয়া মুস্তাফা খাঁ আপনার অধীন সৈন্যদল লইয়া কাটোয়াতে মারহাট্টাদিগের শিবিরস্থানে গমন করিলেন। সুবাদার তাঁহার সহিত যাইবার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রে ভাস্করের ছিন্ন মস্তক আনাইয়া তাহার দর্শনে তৃপ্ত হইলেন, পরে মুস্তাফার সাহায্য করণার্থে গমন করিলেন, কিন্তু কাটোয়ায় উপস্থিত হইলে শত্রুরা পলাইয়া গিয়াছে, এমত সংবাদ পাইলেন, যেহেতুক তাহাদের প্রধান লোকদের বধ বিষয়ক বার্ত্তা শুনিবামাত্র তাহারা ত্বরায় আপন দেশে প্রত্যাগমনার্থে যাত্রা করিয়াছিল।

১০ অধ্যায়।

সুবাদার পূর্ব্বোক্তরূপে মারহাট্টাদিগকে নিবারণ করিয়া বিশ্রাম পাইলে তাহাদের হইতে অধিক ভয়ানক এক শত্রু তাঁহার প্রজাদের মধ্যে উৎপন্ন হইল। যিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, এবং যাঁহার বীরত্বদ্বারা তিনি বঙ্গ

দেশের অধিকার পাইলে মারহাট্টাদিগকে জয় করিয়া-
ছিলেন. সেই মুস্তাফা খাঁ প্রজার অনুপযুক্ত মান প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন, এবং যে জমীদার যে প্রার্থনা করিবে সে
তাহা সুবাদারের নিকটে আর নিবেদন না করিয়া মুস্তা-
ফার নিকটে নিবেদন করিতে লাগিল, তাহাতে আমার
দাস প্রভু হইয়া উঠিবে, সুবাদার এমত ভয় করিলেন।
এই কারণ তিনি মুস্তাফাকে বেহারের কর্তৃত্বপদ দিতে
প্রতিজ্ঞা করিয়াও সেই প্রতিজ্ঞা নিষ্ঠা করণে নিতান্ত অস-
ম্মত হইলেন, কিন্তু মুস্তাফা সেই দান অবিলম্বে চাহিলেন;
সুবাদার আপনি পূর্ব্বে বেহার দেশহইতে নানা উপায়-
দ্বারা যেন সরফরাজকে জয় করিয়া বঙ্গদেশ হস্তগত করিতে
পারক হইয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিলেন, এবং মুস্তাফাও
সেই দেশের কর্ত্তৃত্বে সন্তুষ্ট না থাকিয়া বঙ্গদেশের অধি-
কার পাইতে প্রয়াস করিবেন এমত বোধ করিলেন।
তদবধি সুবাদারের ও মুস্তাফার মধ্যে ঈর্ষ্যা জন্মিলে মু-
স্তাফা যখন রাজসভায় যাইতেন, তখন অস্ত্রধারি সৈন্যগণে
বেষ্টিত হইয়া যাইতেন। শেষে তিনি সুবাদারের কর্ম্ম
ত্যাগ করিতে স্থির করিয়া আপনার সেই মনস্থ সুবা-
দারকে জ্ঞাত করিয়া প্রাপ্য অর্থ চাহিলেন। তাহাতে
সুবাদার তাঁহার হিসাব সকল নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁ-
হাকে সতেরো লক্ষ টাকা দিলেন। পরে তিনি সুবাদারের
নিযুক্ত সেনাপতিগণকে কুপরামর্শ দিয়া প্রভুকে পদচ্যুত
করিয়া তাঁহার অধিকার আপনাদের মধ্যে বিভাগ করি-
তে কহিলেন, কিন্তু তাঁহারা বিশ্বস্ততাপূর্ব্বক আলিবর্দ্দির
সহিত মিত্রতা রক্ষা করিলেন। শেষে তিনি আট সহস্র
অশ্বারূঢ় ও আট সহস্র পদাতিক সৈন্য সঙ্গে লইয়া বঙ্গ-
দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজমহল লুটপাট করিয়া মুঙ্গের

হস্তগত করিয়া পাটনার নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। সেই নগরের কর্ত্তা জৈন উদ্দীন যে অল্প সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন, সেই সকলকে লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে মুস্তাফার বাহন হস্তী যদি ক্ষত বিক্ষত না হইত, তবে নগর অবশ্য তাঁহার হস্তগত হইত। মুস্তাফা হস্তিহইতে নামিলে তাঁহার সৈন্যগণ আপনাদের সেনাপতিকে আর না দেখাতে ত্রাসযুক্ত হইয়া পলায়ন করিল। তদবধি সাত দিন পর্য্যন্ত দুই সৈন্যদলের মধ্যে প্রত্যহ ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল, পরে অষ্টম দিনে মুস্তাফা দৃঢ়রূপে নগর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু বাণদ্বারা বিদ্ধ হওয়াতে তিনি পরাঙ্মুখ হইয়া অযোধ্যা রাজ্যে পলায়ন করিলেন।

মুস্তাফা আপন প্রভুর বিদ্রোহ করিতে মনস্থ করণ সময়ে বঙ্গদেশ আক্রমণার্থে মারহাট্টাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে রঘুজী অলস না হইয়া বরং আপন সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের বধের প্রতিফল দিতে এবং আরও লুট পাইতে ব্যগ্র হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া মুরশীদাবাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তৎকালে আলিবর্দ্দি মুস্তাফার পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু মারহাট্টাদিগের আক্রমণের সংবাদ পাইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন। কেননা মুস্তাফাও বেহারদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার নূতন সহায়দিগের নিকটে যাইতে যত্ন করাতে সুবাদার কি রূপে এক সময়ে দুই শত্রুকে নিবারণ করিবেন, এ বিষয়ে অতি সন্দিগ্ধ হইলেন। তাহাতে তুমি মুস্তাফার প্রতি মনোযোগ রাখিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে আসিতে দিও না, আপন জামাতা জৈন উদ্দীনকে এই আজ্ঞা দিয়া সুবাদার আপনি

কাল যাপন করিবার নিমিত্তে রঘুজীর নিকটে লোক পাঠাইয়া তিনি যেন দেশ আক্রমণহইতে নিবৃত্ত হন, এমত নিবেদন করিলেন। পরে আমি তিন কোটি টাকা না পাইলে নিবৃত্ত হইব না, রঘুজী অহঙ্কার পূর্ব্বক এমত উত্তর দিলে শুবাদার সেই মুদ্রা দিতে স্পষ্টরূপে অস্বীকার করিলেন না, কিন্তু দুই মাস পর্য্যন্ত মিথ্যাপ্রত্যাশাদ্বারা তাঁহাকে ভুলাইলেন। ইতিমধ্যে জৈন উদ্দীন মুস্তাফার সহিত যুদ্ধ করিলে ঐ বিদ্রোহী হত হইলেন ও তাঁহার সৈন্য সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

শুবাদার যখন এই জয়ের সংবাদ পাইলেন, তখন এক শত্রুহইতে আপনাকে মুক্ত দেখিয়া মারহাট্টাদিগের নিকটে অহঙ্কার পূর্ব্বক উত্তর পাঠাইলেন, তাহাতে বর্ষাকালের পরে যুদ্ধ করণার্থে উভয় পক্ষীয় সৈন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কএক বার ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইলে রঘুজী ক্ষয় পাইলেন, এবং শমসের খাঁ ও সরদার খাঁ নামক শুবাদারের দুই সেনাপতি যদি বিশ্বাসঘাতক না হইতেন, তবে রঘুজী অবশ্য ধরা পড়িতেন। শেষে কাঁটোয়ার নিকটে ভারি যুদ্ধ হইলে মারহাট্টাদিগের সম্পূর্ণ পরাভব ও ঘোরতর সংহার হইল, তাহাতে অবশিষ্ট সকলে স্বদেশে পলায়ন করিল। পূর্ব্বোক্ত দুই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মারহাট্টাদিগের সহিত নিয়ম স্থির করিয়াছেন, এমত প্রমাণ পাইয়া আলিবর্দ্দি অল্প কাল পরে তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন, তাহাতে তাঁহারা ছয় সহস্র লোকের সহিত বেহার দেশস্থ দুর্ব্বাঙ্গাতে আশ্রয় লইলেন। তৎকালে শুবাদার কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পাওয়াতে অতি সমারোহ পূর্ব্বক আপন দুই দৌহিত্র জৈন উদ্দীনের পুত্রদিগের বিবাহ সমাপ্ত করিলেন।

কটক প্রদেশ তখনও মারহাট্টাদিগের হস্তগত হও-

হাতে আলিবৰ্দ্দি তথাহইতে তাহাদিগকে দূর করিতে স্থির করিয়া মীর জাফর নামক আপনার এক উত্তম সেনাপতিকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। জাফর মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যাইয়া সুখভোগে মগ্ন হইলেন, এবং শত্রুগণ নিকটে আইলে বৰ্দ্ধমানে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু আত্তা উল্লা খাঁ নামক তাঁহার অধীন এক সেনাপতি যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। কতক দিনাবধি তাঁহার সঙ্গে এক মহন্ত ছিল, সে তাঁহাকে সুবাদার হইবার আশা দেওয়াতে তিনি এই বিজয় আপনার সুযোগ জ্ঞান করিয়া নিজ প্রভুকে পদচ্যুত করণার্থে বিদ্রোহী হইলেন, এবং মীর জাফরকে বেহার দেশ দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহাকেও স্বপক্ষে আনিলেন, কিন্তু অল্প দিনের পরে জাফর আপন উত্তম বন্ধুদিগের পরামর্শ শুনিয়া ঐ কুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিলেন। আলিবৰ্দ্দি এই নূতন বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ শুনিবামাত্র আপনি তথায় গিয়া মীর জাফরকে ও আত্তা উল্লা খাঁকে কৰ্ম্মহইতে বিদায় করিলেন, পরে সেই দুই সেনাপতির ও তাঁহাদের অধীন কিয়দংশ সৈন্যের বিদায়দ্বারা তাঁহার বলের হ্রাস হইলেও তিনি মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ১৭৪৮ শালের বর্ষাকালের পূর্ব্বে মুরশীদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর নূতন বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইল। জৈন উদ্দীন নামে তাঁহার যে ভ্রাতৃপুত্র বেহার দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজধানীতে আসিয়া রাজসভার ঐশ্বর্য্যদ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার দুই জন ভ্রাতার অক্ষমতা ও পিতৃব্যের বার্দ্ধক্য মনে পড়িলে তাঁহার এমত বোধ হইল যে কিঞ্চিৎমাত্র যত্ন করিলে সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হওয়া আমার সাধ্য।

ইহা ভাবিয়া তিনি পত্রদ্বারা আলিবর্দ্দির নিকটে এইরূপ কথা নিবেদন করিলেন, আপনি শমসের খাঁ ও সরদার খাঁ নামক যে দুই সেনাপতিকে বিদায় করিয়াছেন, তাঁহারা দুর্ব্বাঙ্গাতে ক্রমে ২ অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, অতএব তাঁহাদিগকে পরাজয় করা কিম্বা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করা আবশ্যক; আর আপনি যদি সম্মত হন, তবে আমি তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অনুগামি সকলকে সৈন্যমধ্যে গ্রাহ্য করিব। ইহাতে তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যেন আপন সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া শেষে সিংহাসনের নিমিত্তে যুদ্ধ করণে সমর্থ হন। শুবাদার অনেক সন্দেহ পূর্ব্বক তাঁহার নিবেদনে সম্মত হইলে জৈন উদ্দীন ঐ দুই সেনাপতিকে আপনার কর্ম্ম গ্রাহ্য করাইতে তিন জন দূতকে পাঠাইলেন। অনন্তর কথা স্থির হইলে তাঁহারা বহুসৈন্যের সহিত গঙ্গার তীরে আইলেন, এবং ঐ শাসনকর্ত্তা তাঁহাদের নিমন্ত্রণেতে নদী পার হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অপর তাঁহারা তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিলে তিনি তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের সৈন্য সকলকে নদী পার করণার্থে নৌকা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন। অল্প কাল পরে শাসনকর্ত্তার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ করণের দিন নিরূপিত হইল, কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাস না হওয়াতে তিনি কেবল গৃহস্থিত আপনার পরিচারকদের সহিত তাঁহাদিগকে দেখিতে স্বীকার করিলেন। প্রথম দিনে সাক্ষাৎকার নির্ব্বিরোধে হইল, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে রাজপুরী ক্রমে ২ তাঁহাদের সৈন্যেতে পরিপূর্ণ হইল। পরে শাসনকর্ত্তা দর্শনার্থে আগত সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে তাম্বুল বিতরণ করণে ব্যস্ত হইলে তাঁহাদের এক জন এক আঘাতে তাঁ-

হাকে মারিয়া ফেলিল। পুরীমধ্যে তৎক্ষণাৎ রাজদ্রোহ ২ এই কথা উচ্চৈঃশব্দে প্রচারিত হইলে শাসনকর্ত্তার দাসেরা আপন ২ খড়্গ নিষ্কোষ করিল, কিন্তু তখন ঐ বিশ্বাসঘাতকদের নিবারণার্থে আর সময় ছিল না, যেহেতুক নগর তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল।

শমসের খাঁ রাজপুরী লুট করিয়া হত শাসনকর্ত্তার পিতা হাজি আহমদকে আনাইলেন। ঐ বৃদ্ধের নিমিত্তে এক দ্রুতগামি অশ্ব প্রস্তুত থাকাতে তিনি তাহাদ্বারা রক্ষা পাইতে পারিতেন, কিন্তু আপনার স্বর্ণাদি ধন ও স্ত্রীলোকদিগকে ত্যাগ করা তাঁহার অসাধ্য বোধ হওয়াতে বিলম্ব করিলেন, তাহাতে ঐ রাজদ্রোহিরা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার গুপ্ত ধন পাইবার আশাতে সতেরো দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিলে তিনি ব্যথা প্রযুক্ত প্রাণ ত্যাগ করিলেন. পরে ঐ দুরাচারিরা সত্তরি লক্ষ টাকার সমান তাঁহার সমস্ত স্বর্ণ ও রূপা পাইলেন। এবং যন্ত্রণাসময়ে তিনি যে ২ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার বাটীর মধ্যে সেই সকল স্থানে খনন করিয়া বহুমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইলেন।

আপর জৈন উদ্দীনের পত্নীও সেই বিশ্বাসঘাতক পাঠানদিগের হস্তগতা হইলেন। এই ২ রূপে তাঁহারা যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদ্বারা অবিলম্বে আপনাদের সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন, তাহাতে অল্প কালের মধ্যে চল্লিশ সহস্র পদাতিক ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইল।

আলিবর্দ্দির ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র হত ও কন্যা বন্দী হইয়াছেন ও বেহার দেশ বিদ্রোহিদের হস্তগত হইয়াছে, এই সমাচার পাইলে তিনি শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। আর

পাটনার এই রূপ ঘটনার সময়ে তাঁহার পুরাতন শত্রু মারহাট্টা লোকেরা মীর হবীবের সহিত আসিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিল ও তাঁহার রাজধানীকে ভয়েতে পরিপূর্ণ করিল। কিন্তু সুবাদার বৃদ্ধ হইয়াও পূর্ব্ববৎ উৎসাহযুক্ত ছিলেন। তিনি আপনি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া মুরশীদাবাদ নিবাসি লোকদিগকে আপন ২ ধন ও পরিবারের রক্ষার্থে মহানদীর পারে তাহা লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহাতে যত লোকের কিঞ্চিৎ২ ধন ছিল, তাহারা সকলেই পলায়ন করাতে নগর অবিলম্বে লোকশূন্য হইল।

সুবাদার পোনেরো সহস্র অশ্বারূঢ় ও আট সহস্র পদাতি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ রাজদ্রোহিদের সহিত যুদ্ধ করণার্থে যাত্রা করিলেন। তাহাতে মারহাট্টা লোকেরা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব পরামর্শ ত্যাগ করিয়া দেশ লুটপাট করিল না, কিন্তু সুবাদারের আগমনের পূর্ব্বে পাঠানদিগের সহিত মিলিত হওনের আশাতে পর্ব্বতগণের মধ্যদিয়া অতি ত্বরায় গমন করিল। শমসের খাঁ ও সরদার খাঁ আপনাদের সৈন্যের সহিত পাটনাহইতে বাহির হইয়া সেই স্থানে পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইল। বোধ হয় জৈন উদ্দীনের হনন ও পাটনার পরাজয় ও বঙ্গদেশের দিগে যুদ্ধযাত্রা এই সকল বিষয়ক পরামর্শ মীর হবীবের কল্পনার ফল ছিল। সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তিনি ও মারহাট্টাদিগের সৈন্যাধিপতি নিজ তাম্বুমধ্যে পাঠানদিগের দুই জন সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং অধীন লোকের প্রতি প্রধান ব্যক্তি যেমন করিয়া থাকে তদ্রূপ তাঁহাদিগকে সম্ভ্রমসূচক পরিচ্ছদ দিলেন। পরদিনে মীর হবীব বহু সমারোহ পূর্ব্বক ঐ দুই সেনাপতিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহারা

প্রথমে চলিত মতে তাঁহাকে আদর করিলেন, পরে বল পূর্ব্বক তাঁহাকে আটক করিয়া কহিলেন, কেবল তোমার নিবেদন শুনিয়া আমরা এই কর্ম্মেতে সম্মত হইয়াছিলাম, এবং যাহা স্বীকৃত হইয়াছিলাম তাহা পাটনার জয় ও শাসনকর্ত্তার বধদ্বারা সিদ্ধ করিয়াছি, এখন আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া আইলাম; আমাদের যাহা পাওনা তাহা আমরা চাহি, আমাদিগকে চল্লিশ লক্ষ টাকা না দিলে তোমাকে মুক্ত করিব না। মীর হবীব সেই সঙ্কটেও নিরুপায় না হইয়া শুবাদারের সৈন্যসামন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে এমন জনরব জন্মাইলেন, তাহাতে সেই জনরব প্রযুক্ত বড় কলহ হইলে তিনি দুই লক্ষ টাকা দিয়া মুক্ত হইলেন। এই দুই পক্ষের মধ্যে যে বিবাদ হইল, তাহাদ্বারা শুবাদারের অনেক ফল দর্শিল, কেননা পরদিবসে যে যুদ্ধ হইল, তন্মধ্যে শত্রুগণের দুই সৈন্যসমূহ পৃথক্ থাকিল। সেই যুদ্ধে শুবাদার সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। রাজদ্রোহি দুই জন হত হইলেন, ও তাঁহাদের ছিন্ন মস্তক তাঁহার হস্তির পায়েতে বদ্ধ হইল। সংগ্রামের সময়ে মারহাট্টারা বঙ্গদেশীয় সৈন্যগণের বাম পার্শ্বের প্রতি আক্রমণ করিল, ইহা সত্য বটে, কিন্তু শুবাদার তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক দ্রোহিদিগের সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। পরে শুবাদার জয়ী হইলেন, ইহা দেখিয়া মীর হবীব আর যুদ্ধ না করিয়া রণস্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন। অনন্তর আলিবর্দ্দি বিজেতৃরূপে পাটনায় প্রবেশ করিয়া, আপনার যে দুহিতা ও দৌহিত্রগণ শত্রুর হস্তগত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। এই সময়ে তিনি অতিমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া আপনার অধীন সেনাপতিদিগকে সদাচরণের প্রতিফল

দিলেন কেবল তাহা নহে, কিন্তু দুর্ব্বাঙ্গাহইতে দ্রোহি-দিগের স্ত্রীলোক ও সন্তানদিগকেও আনাইয়া মধুর আলাপ-পূর্ব্বক মুক্ত করিলেন। ইহার পূর্ব্বে যে দিনে মীর হবীব মারহাট্টাদিগের পক্ষে গিয়াছিলেন, সেই দিনাবধি আট বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবার আলিবর্দ্দির আজ্ঞাতে রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া রক্ষক লোকদের সমভিব্যাহারে শত্রুদিগের শি-বিরে প্রেরণ করিলেন। পরে আপনার দৌহিত্র জৈন উদ্দীনের পুত্র সরাজ উদ্দৌলাকে বেহার দেশের শাসন-কর্ত্তা করিলেন, এবং রাজা জানকীরামকে তাঁহার নায়েব করিলেন। অল্প কাল পরে তিনি আপন ভ্রাতৃপুত্র সায়দ আহম্মদকে পুরণীয়ার ফৌজদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করি-লেন। এই সকল স্থির করিয়া আলিবর্দ্দি পাটনা ত্যাগ করিয়া পুনরায় নিজ রাজধানীতে আইলেন। সেই সম-য়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি আট উল্লা খাঁর ও মীর জাফ-রের বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং ঐ দুই রাজদ্রোহি সেনা-পতির সহিত যুদ্ধার্থে গমন সময়ে আট উল্লা খাঁকে মুরশীদাবাদের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তথা-পি তিনি ঐ দুই শত্রুর সহিত মিলিবেন, ইহা পথি-মধ্যে রুদ্ধ তাঁহার কোন২ পত্রদ্বারা অবগত হইলেন। এই দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতা প্রযুক্ত সুবাদারের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে তাঁহার পুনরাগমনের পূর্ব্বে আট উল্লা খাঁ তাঁহার আজ্ঞাতে মুরশীদাবাদহইতে বহিষ্কৃত হইলেন। তিনি সপ্ততি লক্ষ নগত টাকা ও নানাবিধ রত্ন সঙ্গে লইয়া ঐ নগর ত্যাগ করিলেন। তিনি যখন ভাগলপুরের ফৌ-জদার ছিলেন, তখন ঐ প্রচুর ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই উদাহরণদ্বারা আলিবর্দ্দির সময়ে রাজত্বের যে অবস্থা ছিল, তাহা আমাদের বোধগম্য হয়। ফলতঃ যে দেশের কর্তৃত্বপদে যে লোক নিযুক্ত ছিলেন, সেই দেশ সেই ব্যক্তিদ্বারা লুট করা যাইত, তাহাতে যাঁহারা রাজকর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা অশেষ ধন লাভ করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইতেন, কিন্তু দরিদ্র প্রজাগণ নষ্ট হইত।

আলিবর্দ্দি কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মারহাট্টাদিগকে তাড়াইয়া দিতে উড়িষ্যাদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনমাত্রে তাহারা পলায়ন করাতে তাহাদের সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করা তাঁহার অসাধ্য হইল। পরে তিনি পর্ব্বতের ও বনের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে মৃগয়া করিতে ক্লান্ত হইয়া পুনরায় নিজ রাজধানীর দিগে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে মীরহবীব তৎক্ষণাৎ বনহইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ববৎ দেশ লুটপাট করিতে লাগিলেন। অতএব তাঁহার আক্রমণার্থে আলিবর্দ্দিকে সৈন্যের সহিত পুনরায় পশ্চিমদিগে যাইতে হইল। এই বার সেই দস্যুদের হইতে দেশ নিতান্ত উদ্ধার করিব, এই রূপ দৃঢ় মনস্থ করিয়া তিনি বর্ষাকালের আরম্ভসময়ে পূর্ব্ববৎ ভাগীরথী পার না হইয়া মেদিনীপুরে শিবির করিয়া বর্ষাকাল যাপন করিতে স্থির করিলেন। পরে সকল প্রস্তুত হইলে ঐ দুর্ভাগ্য সুবাদার নূতন বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে মগ্ন হইলেন।

পুত্রের প্রতি যেরূপ পিতার স্নেহ, নিজ দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলার প্রতি আলিবর্দ্দির তদপেক্ষাও অধিক স্নেহ ছিল, কিন্তু তাঁহার সেই আত্যন্তিক স্নেহ ঐ যুবকের কুস্বভাব জন্মাইয়াছিল। শেষে কএক দুষ্টমনা লোক তাঁহাকে বশে করিয়া ঐ প্রেমিক মাতামহের প্রতি তাঁ-

হার প্রীতিভাব নষ্ট করিয়া রাজ্য লইবার নিমিত্তে যত্ন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিলে তিনি তাহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া আলিবর্দ্দিকে এক পত্র লিখিয়া অন্যায় ব্যবহারের দোষারোপ পূর্ব্বক তিরস্কার করিলেন, পরে নিজ অনুগত লোকদের সহিত পাটনায় গমন করিলেন, কারণ সেই স্থানের কর্তৃত্বপদ এক প্রকার তাঁহাকে দেওয়া গিয়াছিল, অতএব তিনি সেই স্থানে সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া মাতামহের সহিত যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন। মুরশীদাবাদহইতে তাঁহার প্রস্থান করণের সমাচার পাইয়া আলিবর্দ্দি প্রায় হতজ্ঞান হইলেন, কারণ পাটনা আক্রমণ করণের সময়ে যদি তাঁহার প্রিয় বালকের প্রাণ নষ্ট হয়, ইহা ভয় করিলেন। অতএব তিনি শিবির ত্যাগ করিয়া শীঘ্র মুরশীদাবাদে গেলেন, পরে সেই স্থানে এক দিনমাত্র থাকিয়া ঐ যুবার অন্বেষণার্থে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে সেরাজ উদ্দৌলা পাটনায় উপস্থিত হইয়া নায়েব শাসনকর্ত্তা জানকীরামকে স্থানান্তরে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। ঐ যুবার হস্তে নগরকে সমর্পণ করিলে শুবাদার আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন, কিন্তু ঐ সুবা মরিলে তিনি আমাকে কখনো ক্ষমা করিবেন না, ইহা সেই নায়েব বুঝিলেন, তাহাতে সেরাজ উদ্দৌলার ভিরু স্বভাব তাঁহার উপকারী হইয়া উঠিল, যেহেতুক তিনি আপনি যুদ্ধ করিলেন না, কেবল তাঁহার লোকদের মধ্যে সত্তরি জন সাহসিক লোক নগর বেষ্টনকারি মৃত্তিকানির্ম্মিত ভিত্তির এক অংশ ভগ্ন করিল, কিন্তু নগর প্রবেশ করণ সময়ে রক্ষকেরা তাহাদিগকে নিবারণ করিলে তাহারা বীর তুল্য যুদ্ধ করিয়া সকলে হত হইল। তাঁহাদের কর্ত্তা কিঞ্চিৎ দূরে তাঁহাদের পশ্চাৎ আসিয়া যুদ্ধের আরম্ভ

সময়ে কোন গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই স্থানে নায়েব বল ও রক্তপাত বিনা তাঁহাকে ধরিয়া রাজপুরীতে আনাইলেন. আলি বর্দ্দি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দেতে এমত উন্মত্ত হইলেন, যে তাঁহার ভৃত্যগণও তাঁহাকে পরিহাস করিলেন। উপপত্নীর সাক্ষাৎ পাইলে কামাতুর উপপতি যেমন হর্ষে প্রফুল্ল হয়, ঐ বিদ্রোহি দৌহিত্রের সাক্ষাৎ পাইলে বৃদ্ধ শুবাদারের মন তদপেক্ষাও মহাহর্ষে প্রফুল্ল হইল। তিনি তাঁহার কদাচারের নিমিত্তে তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া একেবারে তাঁহার গলদেশ ধরিয়া বার২ তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। দৌহিত্রের রক্ষা প্রযুক্ত তাঁহার এমন আত্যন্তিক আহ্লাদ জন্মিল, যে তাঁহার জ্বর হওয়াতে কিছু দিন পর্য্যন্ত প্রাণরক্ষার কোন আশা প্রায় কাহারো হইল না। তাঁহার এই রূপ সঙ্কটের সমাচার পাইবামাত্র উড়িষ্যা দেশে স্থিত মীর হবীব ও মারহাট্টাগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে পুনরায় উদ্যত হইলেন। এই কারণ আলি বর্দ্দি সম্পূর্ণরূপে উপশম না পাইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুরে যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া উড়িষ্যা দেশের সর্ব্বত্র তাহাদের পশ্চাদ্ ধাবমান হইলেন; শেষে তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকটহইতে স্থানান্তরে যাওয়াতে তিনি নিজ সৈন্যসামন্তের সহিত মুরশীদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

তদবধি যুদ্ধশ্রমে উভয় পক্ষ ক্লান্ত হইতে লাগিল। ঐ দশ বৎসর পর্য্যন্ত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে শুবাদার প্রথম বার ব্যতিরেকে সর্ব্বদা জয়ী হইয়াছিলেন বটে, তথাপি মারহাট্টা লোকদের দুরন্ত ব্যবহারদ্বারা তাঁহার দেশ নষ্ট হইতেছে, ইহা তিনি স্পষ্টরূপে দেখিলেন। তাহাদের উপ-

স্থোম্ব প্রযুক্ত রাজস্বের এমত হানি হইয়াছিল যে তিনি আপন অধিকারের প্রথম বৎসরাবধি রাজকরের একটি টাকাও দিল্লীতে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। কটক অবধি রাজমহল পর্য্যন্ত যে সমস্ত দেশ ভাগীরথীর পশ্চিমদিগে আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর লূটপাট ও গ্রাম দগ্ধ ও মানুষ হত ও শস্যাদি নষ্ট হইত। দুর্ভাগা প্রজারা অনির্ব্বচনীয় দুঃখসাগরে মগ্ন হওয়াতে সুবাদারের নিকটে উপস্থিত হইয়া বার্ষিক শস্যনাশের নিবারণ যদি তিনি করেন, তবে নিয়মিত রাজকর এবং ততোধিক যাহা চাহেন তাহা দিতে স্বীকার করিল। আলি বর্দ্দি প্রজাদের ও আপনার ক্লেশ নিবারণার্থে কোন মতে সেই দুরবস্থার প্রতীকার করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর, এবং দশ বার যুদ্ধ করাতে শরীর শীর্ণ হইয়াছিল, এই জন্যে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশের শুভাবস্থা দেখিতে বাঞ্ছা করিলেন। আর মারহাট্টা লোকেরা এবং মীর হবীব সেই যুদ্ধে নিত্য পরাজিত হওয়াতে আপনারাও ক্লান্ত হইয়াছিলেন, এই জন্যে সন্ধির নিয়ম স্থির করিবার নিমিত্তে এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। সেই নিয়ম যদ্যপি সুবাদারের সম্মানবর্দ্ধক নহে, তথাপি তিনি নিত্য যুদ্ধ অপেক্ষা তাহা আরও ভাল জ্ঞান করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন, অর্থাৎ বঙ্গদেশের চৌট বলিয়া প্রতিবৎসর মারহাট্টা লোকদিগকে বারো লক্ষ টাকা দিতে, এবং মীর হবীবকে উড়িষ্যা দেশের নায়েব শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া সেই দেশ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে, এবং মারহাট্টা সেনাগণের বাকি বেতনের পরিশোধার্থে ঐ দেশের সমস্ত রাজস্ব ব্যয় করণের অনুমতি দিতে, এবং বঙ্গদেশের দক্ষিণে মারহাট্টাদের অলঙ্ঘনীয় সীমারূপে সুবর্ণরেখা

নদী নিরূপণ করিতে স্বীকার করিলেন। এমন হওয়াতে মীর হবীবের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইল, কেননা তিনি আলি বর্দ্দির গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া উড়িষ্যা দেশের কর্ত্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উন্নতি চিরস্থায়ী হইল না। উক্ত সন্ধির পরে তাঁহার সাহায্যে মারহাট্টা লোকদের আর প্রয়োজন না হওয়াতে তাহারা তাহার সরবঞ্চনারে শঠতাপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিল। চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৫৫ শালে, আলি বর্দ্দি ঐ উড়িষ্যা দেশ সম্পূর্ণরূপে মারহাট্টা লোকদিগকে দান করিলেন। এই কর্ম্ম প্রায় তাঁহার জীবনের শেষকর্ম্ম।

১৭৫১ শালে মারহাট্টা লোকদের সহিত সন্ধি করিলে পরে আলি বর্দ্দি খাঁ কিছু কাল পর্য্যন্ত বিশ্রাম পাইলেন। যদ্যপি তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি যুবার ন্যায় যত্ন করিয়া যুদ্ধজন্য দুর্ঘটনার প্রতীকার করিতে চেষ্টান্বিত হইয়া দগ্ধ গ্রাম সকল পুনর্নির্ম্মাণ করাইলেন, পলায়িত প্রজাদিগকে পুনরাহ্বান করিলেন, ঋণ দান করিয়া কৃষকদিগের উপকার করিলেন, এবং যথাসাধ্য কৃষিকর্ম্মের উন্নতি করিলেন। তাঁহার অধিকারের প্রথম দশ বৎসরে যেমন যুদ্ধে তেমনি শেষ পাঁচ বৎসরে নির্ব্বিরোধকালে তাঁহার বুদ্ধির কৌশলতা প্রকাশ পাইল। তিনি দিবসের প্রত্যেক ঘণ্টার বিশেষ কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া সুনিয়মপূর্ব্বক রাজকর্ম্ম চালাইতেন। তাঁহার এই রূপ নিত্য মনোযোগ ও যত্নদ্বারা দেশের উন্নতি হইলে মারহাট্টাদিগের অপকার প্রায় লোকদের স্মরণে হইল না।

মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি করণাবধি ১৭৫৬ শাল পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। পরে ঐ শালে পরম যত্নদ্বারা স্থাপিত তাঁহার

মহির্ষারূপ মন্দির একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। উক্ত বৎসরের আরম্ভকালে ইক্রাম উদ্দৌলা নামক তাঁহার এক দৌহিত্রের প্রাণ বিয়োগ হইল। নেওয়াইশ মুহম্মদ নামক আলি বর্দ্দির যে ভ্রাতৃপুত্র ঐ যুবাকে দত্তকরূপে গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বিয়োগে হতবুদ্ধি হইলেন। সুবাদারের অপর দৌহিত্র যে সেরাজ উদ্দৌলা তিনি মাতামহের আত্যান্তিক বাৎসল্য প্রযুক্ত দুশ্চরিত্র হইয়া সর্ব্বপ্রকার কুক্রিয়াতে রত ছিলেন, এবং তাঁহাকে বারণ করিতে কাহারও সাহস হইত না। তিনি লম্পট সঙ্গিসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া আড়ম্বরপূর্ব্বক মুরশীদাবাদের সকল পথে বিহার করিয়া স্ত্রী পুরুষ সাধারণের প্রতি সর্ব্বপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতেন। গতায়াত করণ সময়ে তাঁহার দেখা হইলে নগরের লোকেরা কহিত, পরমেশ্বর উঁহাহইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আশী বৎসর বয়স্ক তাঁহার মাতামহ বাৎসল্য প্রযুক্ত অন্ধীভূত হওয়াতে ঐ সকল দৌরাত্ম্যে কিছুই মনোযোগ করিতেন না, তাহাতে সেই দুষ্ট যুবার দুঃসাহস আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি ঢাকার নায়েব শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলি খাঁর ও তাঁহার পরিজনের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে নষ্ট করিতে স্থির করিয়া প্রথমে আপন অনুচরদের মধ্যে এক জনকে তথায় প্রেরণ করিলে সে দিবাতে লোক সাধারণের সাক্ষাতে উক্ত মহাশয়ের ভাগিনেয়কে বধ করিল। পরে তিনি মাতামহের নিকটে হোসেন কুলি খাঁকে বধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তাঁহার কর্ত্তা নেওয়াইশ মুহম্মদের অনুমতি বিনা তাহা করা যায় না, ইহামাত্র বলিয়া আলি বর্দ্দি ঐ দুষ্ক্রিয়ার নিষেধ করিলেন না। তথাপি যেন তাহা দেখিতে না হয়, এই

নিমিত্তে মুরশীদাবাদহইতে বহির্গত হইয়া মৃগয়া করিতে রাজমহলে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা পত্নী যে সেরাজ উদ্দৌলার মাতামহী, তিনি আপনি নেওয়াইশের নিকটে গিয়া তাঁহার নির্দ্দোষ মিত্র ও ভৃত্যকে নষ্ট করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; এবং নেওয়াইশের পত্নী যে ঘোসিতী বেগম, তিনিও সেই প্রার্থনাতে সাহায্য করিলেন। তাহাতে নেওয়াইশ অস্বীকার করিতে না পারাতে এক প্রকার আপন সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎহইতে গৃহে গমন সময়ে সেরাজ উদ্দৌলা হোসেন কুলি খাঁর বাটীর নিকট দিয়া গমন করিয়া অনুচরদিগের দ্বারা তাঁহাকে বাহিরে আনাইয়া আপনার দৃষ্টিগোচরে খণ্ড বিখণ্ড করাইলেন, এবং তাঁহার সহিত তাঁহার চক্ষুহীন ভ্রাতাও বহিষ্কৃত হইয়া ছেদিত হইলেন। যে মুহম্মদীয় লোক ঐ সকলের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তিনি বলেন, এই সকল ঘৃণার্হ নরহত্যা প্রযুক্ত পরমেশ্বর আলি বর্দ্দির অপরাধগ্রস্ত বংশকে শাপ দিলেন। অতি অল্প দিন পরে নেওয়াইশ মরিলেন; এবং সায়দ আহম্মদ নামক তাঁহার যে ভ্রাতা পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনিও দুই মাসের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। শেষে ১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে দৌহিত্রের দুরাচারে ভগ্নচিত্ত এবং দুই জন ভ্রাতৃপুত্রের মৃত্যু প্রযুক্ত শোকসাগরে মগ্ন আলি বর্দ্দিরও প্রাণ বিয়োগ হইল।

যুদ্ধের সময়ে এবং নির্বিরোধ কালে আলি বর্দ্দির অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কর্ম্মেতে তাঁহার যে মহৎ উৎসাহ তাহার একটি প্রমাণ এই যে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি সৈন্যসামন্তের সহিত উড়িষ্যা দেশ দিয়া মারহাট্টা লোকদের পশ্চাৎ ধাবন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের রাজকার্য্য

পাইলে পরে তিনি বিদেশি শত্রুগণের কিম্বা আপনার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে২ দশ বৎসর পর্য্যন্ত নিত্য সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন। অনন্তর অবশিষ্ট পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত নির্বিরোধ কালে তাঁহার দেশশাসনের ধারা অতি প্রশংসনীয় ছিল। মুস্তাফা খাঁ নামক তাঁহার সেনাপতি কলিকাতায় স্থিত ইংরাজ লোকদিগকে আক্রমণ করিতে বার২ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিতেন, স্থলের রক্ষা আমার দুঃসাধ্য, সমুদ্রও যদি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তবে সেই দাহ নির্ব্বাণ করিতে কাহার সাধ্য? সমুদ্রে ইংরাজ লোকদের অধিক পরাক্রম আছে, ইহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন; অতএব তাঁহাদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করিলে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় বণিক্‌দের সামুদ্রিক বাণিজ্য নষ্ট করিবেন, ইহা বুঝিলেন। তাঁহার অধিকার সময়ে করাসিস্ ও ওলন্দাজ ও ইংরাজ লোকেরা নির্বিরোধে কাল যাপন করিতেন। কেবল দুই বার মারহাট্টা লোকদের নিবারণার্থে অর্থের অভাব হওয়াতে তিনি তাঁহাদের নিকটে উপঢৌকন আদায় করিলেন। তাঁহার লব্ধ রাজ্য শেষে তাঁহাদের হস্তগত হইবে, এমন অনুমান তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তাঁহার দৌহিত্র ইংরাজ লোকদের শত্রু, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে আপনার মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল সকল ইউরপীয় লোকদের বশীভূত হইবে, এমত ভয় করিতেন। তাঁহার যে দৌহিত্র রাক্ষসের ন্যায় দুরাচারী হইয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রতি আলি বর্দ্দির বিবেচনাহীন যে বাৎসল্য সে তাঁহার প্রধান দোষ। সেই দোষের বিষয়ে অতি বিলম্বে তাঁহার চেতনা জন্মিল। যখন তিনি মৃতশয্যাগত ছিলেন, তখন তাঁহার কোন২ ভৃত্য উত্তরাধিকারির

নিকটে তাঁহার প্রণয়জনক বাক্য প্রার্থনা করিলে তিনি উত্তর করিলেন আমার মরণান্তে যদি তিন দিন পর্য্যন্ত মাতামহের প্রতি সেরাজ উদ্দৌলার প্রীতি ব্যবহার দেখ, তবে আপনাদের বিষয়েও শুভ আশা করিতে পারিবা।

১১ অধ্যায়।

তৎকালে রাজ্য পরিবর্ত্তন হওনের সম্ভাবনা প্রকাশ পাইতে লাগিল; যুদ্ধে বিক্রান্ত ও রাজকার্য্যে তৎপর যে আলি বর্দ্দি খাঁ, তিনি মারহাট্টাদিগকে বঙ্গদেশের অধিকার প্রাপ্তিহইতে নিবারণ করিতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া যদ্যপি বার বার তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন, তথাপি অবশেষে তাহাদের লাভজনক সন্ধি করিয়া প্রতি বৎসর বারো লক্ষ টাকা তাহাদিগকে দিতে স্বীকার করা, এবং আপন মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে আপনার অধীন তিন দেশের মধ্যে এক দেশ অর্থাৎ উড়িস্যা দেশ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা আবশ্যক হইয়াছিল; তাঁহার মৃত্যুর পরে যে যুবা রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার বয়স কেবল চব্বিশ বৎসর, এবং স্বভাব অতি অহঙ্কারী ও দুরন্ত ও চঞ্চল ও দুশ্চরিত্র, এবং মন কেবল আত্মসুখের চেষ্টাতে মগ্ন ছিল। বাঙ্গালা ও বেহার দেশ যে চিরকাল এমত ব্যক্তির বশীভূত থাকে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যাঁহার কীর্ত্তি ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত ছিল, সেই আলি বর্দ্দি লোকান্তরে গেলে পরে মারহাট্টা লোকেরা পুনরায় তাঁহার দেশ আক্রমণ করিতে প্রস্তুত ছিল, এবং তাহা ঐ দুরন্ত জাতির বশীভূত হইবে এমত সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু সর্ব্ববিধাতা ঈশ্বরের অন্য প্রকার অভিপ্রায় সফল হইল। আলি বর্দ্দির মৃত্যুসময়ে ভারতবর্ষের

অধিকারী হওনের প্রত্যাশা যে ইংরাজ লোকদের মনে উদিত হয় নাই, তাঁহারাই বঙ্গদেশের রাজত্ব এবং অবশেষে সমস্ত ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই রাজ্য কি প্রকারে ইংরাজ লোকদের অধীন হইল, তাহার বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে লিখিতে বিহিত বুঝিলাম।

১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে সেরাজ উদ্দোলা বঙ্গ ও বেহার দেশের রাজত্ব পাইলেন। তৎকালে দিল্লীর বাদশাহ এমত ক্ষীণাবস্থাতে ছিলেন যে সেই নূতন সুবাদার তাঁহার নিকটে অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনা করণ অনাবশ্যক জ্ঞান করিলেন। ঐ সুবাদার রাজ্যের প্রথমে আপনার হত পিতৃব্য নেওয়াইশ মুহম্মদের পত্নীর সমস্ত ধন হরণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন; কারণ ঐ নেওয়াইশ ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ঢাকার শাসনকর্ত্তা হইয়া অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া লোকান্তর গত হইলে তাঁহার ভার্য্যা স্বামিধনের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ঐ ধনরক্ষার্থে নিযুক্ত তাঁহার সেনাগণ বিপৎসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করাতে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নির্ব্বিরোধে সুবাদারের বাটীতে নীত হইল, এবং ঐ নারী আপনার বাসগৃহহইতে বহিষ্কৃত হইলেন। রাজবল্লভ নামক যে জন ঢাকাতে ঐ নেওয়াইশ মুহম্মদের নায়েব ছিলেন, তিনি মুসলমানদের রাজ্যের রীত্যনুসারে সমুদয় দেশ লুট করিয়া প্রচুর ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ সালের প্রথমে নেওয়াইশের মৃত্যু হয়, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। তখন আলি বর্দ্দি সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু জরাপ্রযুক্ত ক্ষীণবুদ্ধি হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দৌহিত্র তৎক্ষণাৎ মুরশীদাবাদ নিবাসি রাজবল্লভকে ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়া ঢাকাতে তাঁহার সমস্ত

সম্পত্তি হরণ করিতে চর পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস পরিজনগণের সমস্ত ধন নৌকাতে তুলিয়া গঙ্গাসাগরে কিম্বা জগন্নাথক্ষেত্রে তীর্থযাত্রার ছলে কলিকাতায় আইলেন। ১৭ মার্চ্চ তারিখে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ নগরে বাস করিতে তথাকার শাসনকর্ত্তা ড্রেক সাহেবের অনুমতি পাইয়া পিতার মোচন সংবাদ শ্রবণ পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে স্থির করিলেন। সেরাজ উদ্দৌলা ঐ ধনপ্রাপ্তির আশাতে বঞ্চিত হওয়াতে রাগাপন্ন হইয়া কৃষ্ণদাস যেন শীঘ্র আপনার নিকটে সমর্পিত হন, এই নিমিত্তে কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু ঐ দূত কোন বিশ্বাসজনক পত্র না আনাতে ড্রেক সাহেব তাঁহাকে নগরহইতে বাহির করিয়া দিলেন।

অপর অত্যল্প দিনের মধ্যে ফরাসিদের সহিত ইংরাজ লোকদের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে, ইউরপহইতে এমত সংবাদ উপস্থিত হইল। তৎকালে সমুদ্রতীরস্থ মান্দ্রাজাদি নানা স্থানে ফরাসিদের বিস্তর সৈন্য ও জাহাজ ছিল, এবং কলিকাতায় ইংরাজদের যত ইউরপীয় সৈন্য ছিল, চন্দননগরে তাহার দশগুণ সৈন্য তাঁহাদের ছিল, এ কারণ ইংরাজ লোকেরা আপন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই সমাচার সেই সিংহাসনস্থ দুরন্ত যুবকের কর্ণগোচরে শীঘ্র উপস্থিত হইলে তিনি দীর্ঘকালাবধি ইংরাজদের হিংসেচ্ছুক হওয়াতে ড্রেক সাহেবকে কঠিনরূপে পত্র লিখিয়া নূতন প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিলেন, এবং পুরাতন দুর্গ ভগ্ন করিতে ও কৃষ্ণদাসকে অবিলম্বে সমর্পণ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, আলি বর্দ্দির মৃত্যুর দুই এক মাস পূর্ব্বে সেরাজ উদ্দৌলার পিতৃব্য যে সয়েদ আহ-

ম্মদ, তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল, এবং তিনি আপন সমস্ত ধন ও সৈন্য ও পূরণীয়ার রাজ্য নিজ পুত্র শোকৎ জঙ্গকে দিয়াছিলেন। সেরাজ উদ্দৌলা যে সময়ে শুবাদার হইলেন, তাঁহার ঐ কুটুম্ব তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূরণীয়ার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুই জন কর্কশ ও ক্রূর, ও বিবেচনারহিত হওয়াতে বিস্তর দিন নির্ব্বিবাদে থাকিবেন না, তাহা সুস্পষ্ট ছিল। সেরাজ উদ্দৌলা পদ প্রাপ্তিমাত্রে আপন মাতামহের নিযুক্ত সমুদয় পাত্র ও সেনাপতিদিগকে বিদায় করিয়া কতিপয় লম্পট যুব লোককে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে পাপকর্ম্মে সাহস প্রদান করিত, এবং প্রতি দিন অন্যায় ও দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্তি দিত, তাহাতে কোন ধনির ধন ও কুলবতীর লজ্জা রক্ষা পাইত না। অতএব এতদ্দেশীয় প্রধান লোকেরা ঐ সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিতে ক্লান্ত হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন লোককে রাজসিংহাসনে বসাইতে মন্ত্রণা করিলে ঐ শোকৎ জঙ্গ তাঁহাদের মনোনীত হইলেন। সেরাজ উদ্দৌলাহইতে তিনি উত্তম হইবেন, এমত প্রমাণ না থাকিলেও তাঁহারা ভাবি বিষয়ে প্রত্যাশা করিয়া আপনাদের মধ্যে নিয়ম স্থির করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে এতদ্দেশের শুবাদার করিবার নিমিত্তে বাদশাহের অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনা করিতে দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিলেন, এবং বাদশাহকে বার্ষিক কররূপে এক কোটি মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন, এ কারণ তাঁহাদের প্রার্থনা ফলযুক্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারিল না।

সেরাজ উদ্দৌলা এই কুমন্ত্রণার অনুসন্ধান পাওয়াতে তৎক্ষণাৎ নিজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কুটুম্বের বিনাশার্থে পূরণীয়াতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ যখন

রাজমহলে উপস্থিত হইয়া গঙ্গা পার হইবার নিমিত্তে প্রবৃত্ত হইতেছিল, এমত সময়ে তিনি কলিকাতার শাসনকর্ত্তা দ্রেক সাহেবের প্রতি লিখিত আপন পত্রের উত্তর পাইলেন। তাহার মধ্যে দ্রেক সাহেব সুবাদারের আজ্ঞাপালন স্পষ্টরূপে অস্বীকার করিলেন। এই উত্তর পাওয়াতে সেরাজ উদ্দৌলার মনে অপরিমিত ক্রোধ জন্মিল। তিনি ইংরাজ লোকদের প্রতি রাজদ্রোহি লোকদিগকে আশ্রয় দেওনের ও পররাজ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করণের দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিতে মনস্থ করিলেন, অতএব নিজ সৈন্যকে রাজমহলস্থ শিবির উত্থাপন করিয়া অবিলম্বে কলিকাতার প্রতিকূলে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। পথিমধ্যে কাশীম বাজারের কর্ম্মশালা লুট করিলেন, এবং সেই স্থানে ইউরপীয় যত লোকদিগকে পাইলেন, সেই সকলকে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

কলিকাতায় ইংরাজ লোকেরা ষষ্টি বৎসরাপেক্ষা অধিক কালাবধি নির্ব্বিরোধে বাস করাতে তাঁহাদের দুর্গের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল, এবং নির্ভয়তা প্রযুক্ত দুর্গ প্রাচীরের অতি নিকটে অর্থাৎ আশী হস্ত অন্তরে নানা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গমধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ এক শত সত্তর জন সেনা ছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল ষষ্টি জন ইউরপীয় লোক; এবং তাঁহাদের বারুদ সকল পুরাতন ও বিকৃত, এবং কামান সকল মর্চ্যাতে মলিন হইয়াছিল। অতএব সেরাজ উদ্দৌলা যখন চল্লিশ বা পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ও এক দল উত্তম গোলন্দাজের সহিত নগরাক্রমণার্থে আইলেন তখন ইংরাজ লোকেরা রক্ষার উপায় নাই, ইহা দেখিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকটে পুনঃ২ পত্র প্রেরণ করিলেন, এবং অধিক মুদ্রাও দিতে স্বীকার করি-

লেন; কিন্তু সুবাদার কিছুই মনোযোগ করিলেন না, তিনি ইংরাজদিগকে একেবারে নিঃশেষ করিতে মনে স্থির করিয়াছিলেন, একারণ কোন উত্তর প্রেরণ না করিয়া ক্রমে আসিতে লাগিলেন।

অপর ১৭ জুন সুবাদারের সৈন্যগণ নগর বেষ্টন করিয়া পরদিনে চতুর্দ্দিগে আক্রমণ করিয়া প্রাচীরের নিকটস্থ গৃহ সকল হস্তগত করিল, এবং তথাহইতে এমত গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল যে প্রায় দুর্গস্থ কোন লোক শত্রুদিগকে দেখা দিতে সাহসী হইল না। ঐ দিবসে অনেক লোক হত এবং অধিক লোক ক্ষতবিক্ষত হইল, এবং দুর্গের বহির্ভাগ শত্রুদের হস্তগত হওয়াতে ইংরাজদিগকে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে হইল। অপর রাত্রি হইলে দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থিত কতিপয় বৃহৎ গৃহে অগ্নি লাগাইলে অত্যন্ত উত্তাপ হইল। তাহাতে কর্ত্তব্য কি, ইহা নিশ্চয় করণার্থে ইংরাজেরা এক যুদ্ধমন্ত্রণার সভা করিলে সেনাপতিগণ অকর্ম্মণ্য হওয়াতে কহিলেন, পলায়ন ব্যতিরেকে আমাদের রক্ষার আর উপায় নাই। দুর্গমধ্যে এতদ্দেশীয় এত লোক আশ্রয় লইয়াছিল, যে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহাদের কুলাইতে পারিল না। অতএব পরদিনের প্রাতঃকালে অগ্রে স্ত্রীলোক সকলকে, পরে পুরুষদিগকে নিকটবর্ত্তি সকল জাহাজে আরোহণ করাইয়া নগর ত্যাগ করিতে স্থির করা গেল। এই সকল কর্ম্ম নিয়মিতরূপে চালাইবার উপযুক্ত বুদ্ধিমান লোক কেহ তৎকালে দুর্গমধ্যে ছিল না, সকলেই পরের আজ্ঞা অসহ্য জ্ঞান করিয়া আপন২ ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক সকল জাহাজে উঠিলে পরে দুর্গস্থিত লোকদের এবং নাবিকদের মন ভয়েতে একেবারে মগ্ন

হইল। সকলে বেগে নদীর তীরে দৌড়িয়া গেলে নাবিকেরা ত্রাসযুক্ত হইয়া নৌকা খুলিতে লাগিল, তাহাতে প্রত্যেক জন কেবল নিজ প্রাণরক্ষার্থে ব্যস্ত হওয়াতে যে ব্যক্তি যে নৌকা ধরিতে পারিল, সে তাহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া আশ্রয় লইল। শাসনকর্ত্তা ড্রেক সাহেব এবং সৈন্যাধিপতি প্রায় সকলের অগ্রে পলাইয়া গেলেন। ক্ষণেক কালের মধ্যে কূলে একটি নৌকাও দেখা গেল না, সকলই জাহাজের নিকটে কিম্বা হাওড়াতে পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক সেনা ও ভদ্র লোক তীরে অবশিষ্ট ছিলেন। গবর্ণর সাহেবের পলায়ন অবগত হইয়া তাঁহারা সভা করিয়া হলুএল্ সাহেবকে আপনাদের প্রভু করিলেন। পলায়িত লোকেরা যে২ জাহাজে ছিলেন, সে সমস্ত জাহাজ তথাহইতে এক ক্রোশ দূরে গিয়া লঙ্গর ফেলিয়া থাকিল। অপর ১৯ জুন বিপক্ষগণ পুনর্ব্বার দুর্গ আক্রমণ করিল, কিন্তু সে দিনে তাহারা তাড়িত হইয়া পরাস্ত হইল। এই সুযোগের সময়ে দুর্গে অবশিষ্ট লোকেরা ধ্বজাদি তুলিয়া আপনাদের উপকারার্থে আসিতে জাহাজস্থ লোকদের নিকটে সঙ্কেত করিলেন, কিন্তু সেই উপকার দুষ্কর না হইলেও তাঁহারা ঐ পরিত্যক্ত লোকদের উদ্ধারার্থে কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। তথনও সেই দুর্ভাগ্যেরা নিরাশ হইলেন না। চিৎপুরে রায়ল জর্জ নামক এক জাহাজ লঙ্গর করিয়াছিল, তাহা দুর্গের সম্মুখে আনয়ন করিবার আজ্ঞা দিতে হলুএল্ সাহেব স্বজাতীয় দুই জনকে পাঠাইলে তাহা আসিতে লাগিল, কিন্তু পথিমধ্যে চড়াতে বদ্ধ হওয়াতে আর মুক্ত হইতে পারিল না। এই প্রকারে ঐ হতভাগ্য সেনাগণের অবশিষ্ট আশাও বিনষ্ট হইল। পরে ঐ ১৯ জুন রাত্রিকালে বিপক্ষগণ দুর্গের চতু-

নির্কেস্থিত অবশিষ্ট সমুদয় গৃহেতে অগ্নি লাগাইল, এবং ২০ জুন পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর আক্রমণ করিল। তাহাতে হল্‌এল্ সাহেব অধিক যুদ্ধের নিরর্থকতা বুঝিয়া সুবাদারের সেনাপতি মাণিকচন্দ্রের নিকটে সন্ধির নিমিত্তে পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে অপরাহ্নে চারি ঘণ্টার সময়ে শত্রুগণের মধ্যে এক জন কামান রহিত করিতে ইঙ্গিত করিলে, সেনাপতিহইতে উত্তর আসিয়া থাকিবে, এমন বোধ করিয়া ইংরাজ লোকেরাও গুলি মারিতে নিবৃত্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ শত্রুরা সুযোগ পাইয়া প্রাচীরের নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাতে এক ঘণ্টার মধ্যে দুর্গ তাহাদের হস্তগত হওয়াতে তাহারা সমস্ত গৃহ লুট করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সেরাজ উদ্দৌলা দোলাযানে আইলে সমস্ত ইউরপীয় লোক তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। তখন হল্‌এল্ সাহেবের হস্ত বদ্ধ ছিল, কিন্তু সুবাদার তাহা মোচন করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, আপনকার মস্তকের এক কেশও কেহ স্পর্শ করিবে না। আরও কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই অত্যল্প লোক চতুঃশত গুণ অধিক সৈন্যের সহিত এতাবৎ কাল যুদ্ধ করিল। অপর তিনি প্রাঙ্গণে সভা করিয়া আপনার নিকটে কৃষ্ণদাসকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ইংরাজেরা যে ঐ কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আক্রমণের এই এক প্রধান কারণ ছিল, অতএব বোধ হইল, ঐ ব্যক্তির কঠিন দণ্ড হইবে, কিন্তু নবাব তাহা না দিয়া তাঁহাকে এক সম্ভ্রমজনক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর সেরাজ উদ্দৌলা এতদ্দেশীয় এক সেনাপতিকে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া ছয় ঘণ্টার পরে আপন শিবিরে

প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সময়ে দুর্গমধ্যে এক শত ছে-চল্লিশ জন ইউরপীয় লোক বন্দী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন মাত্র স্ত্রী লোক ও বারো জন ক্ষতাবিক্ষত সেনাপতি। দুর্গাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে সেই রাত্রিতে সাবধানে রাখিবার স্থান অন্বেষণ করিলে দুর্গমধ্যে অবাধ্য সেনাদিগকে রুদ্ধ করিবার নিমিত্তে যে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, তাহার মধ্যে আত্যন্তিক গ্রীষ্মকালে যবনেরা ঐ সকল ইউরপীয় বন্দিগণকে বন্ধ করিয়া রাখিল। সেই গৃহ বারো হস্ত দীর্ঘ ও নব হস্ত প্রস্থ, এবং বায়ু প্রবেশার্থে দুই অগ্রভাগে দুইটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। তাহাতে ঐ রাত্রিতে বন্দিদের অনির্বচনীয় যন্ত্রণা হইল। অতিশয় অনিবার্য্য পিপাসাতে পীড়িত হওয়াতে তাঁহারা রক্ষকদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ জল পাইলেও ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে বাতাসের চেষ্টাতে গবাক্ষদ্বারের নিকটে আসিতে প্রাণপণ করিতেন, এবং আমাদিগকে গুলি মারিয়া একেবারে এই যন্ত্রণার শেষ কর, রক্ষকদের কাছে এমত প্রার্থনা করিতেন। পরে অবসন্ন হইয়া একে২ ভূমিতে পড়িয়া মরিতে লাগিলেন; তথাপি অবশিষ্ট অত্যল্প লোক শবসমূহের উপরে দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করণের স্থান পাওয়াতে প্রাণে বাঁচিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ গৃহের দ্বার মুক্ত হইলে এক শত ছেচল্লিশ জনের মধ্যে কেবল তেইশ জন জীবদ্দশাতে আছে, ইহা দৃষ্ট হইল। ঐ ব্লাক হোল নামক কারাগারে এত মনুষ্যের হত্যা প্রযুক্ত কলিকাতার পরাজয় মনে করিলে সর্ব্বসাধারণের ঘৃণা জন্মে, এবং তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদেশীয় লোকেরা উক্ত ঘটনা পুনঃ২ স্মরণ করে, ও সেরাজ উদ্দৌলাকে রাক্ষস-তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকাল

পর্য্যন্ত তিনি ঐ মনুষ্যনাশের সংবাদমাত্র পাইলেন না। মাণিকচন্দ্র নামক যে হিন্দু লোক ঐ রাত্রিতে দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন, কেবল তিনি এ বিষয়ে দোষী। তথাপি ২১ জুনের প্রাতঃকালে যখন নবাব ঐ ভয়ানক ব্যাপারের সমাচার প্রাপ্ত হইলেন, তখন কিছুমাত্র খেদ প্রকাশ করিলেন না। ব্লাক হোলে রুদ্ধ বন্দি লোকদের মধ্যে যাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হলওএল সাহেব এক জন ছিলেন। অতএব সুবাদার তাঁহাকে আনাইয়া ধনাগার দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু তথায় কেবল অর্দ্ধ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হওয়াতে সুবাদার অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। সেরাজ উদ্দৌলা নয় দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া তাহার নাম আলিনগর রাখিয়া মুরশীদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। ২ জুলাই মাসে তিনি নদী পার হইয়া ওলন্দাজ ও ফরাসি লোকদিগকে উপঢৌকন আনিতে কহিলেন, এবং তাহারা যদি অস্বীকার করেন, তবে ইংরাজদের ন্যায় তাঁহাদিগকে নষ্ট করিবার ভয় দেখাইলেন। তাহাতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ টাকা, ও ফরাসিরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়া উদ্ধার পাইলেন। যে বৎসরে কলিকাতা শত্রুহস্তগত হইলে ইংরাজ লোকেরা বঙ্গদেশহইতে বহিষ্কৃত হইলেন, সেই বৎসরে অর্থাৎ ১৭৫৬ শালে দানিমার লোকেরা ভূমির অধিকারপত্র পাইয়া শ্রীরামপুর পত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মুরশীদাবাদে উপস্থিত হইলে পরে সেরাজ উদ্দৌলা জয়দ্বারা প্রফুল্লচিত্ত হওয়াতে পুনর্ব্বার পুরণীয়ার শাসনকর্ত্তা আপনার কুটুম্ব শোকৎ জঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন। বিবাদ উৎপাদনের নিমিত্তে তিনি আপনার এক জন ভৃত্যকে তথাকার ফৌজদার করিয়া সেই

ব্যক্তিকে ঐ পদে স্থাপন করিতে আপনার কুটুম্বকে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে ঐ যুবা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পত্রদ্বারা এই উত্তর করিলেন, এই তিন প্রদেশের যথার্থ সুবাদার আমি আছি, দিল্লীহইতে নিয়োগপত্র পাইয়াছি, তুমি মুরশীদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যে খানে সেখানে গমন কর। এমন উত্তর পাওয়াতে সেরাজ উদ্দৌলা অতিশয় রাগাপন্ন হইয়া সৈন্যসামন্ত একত্র করিয়া অবিলম্বে পূরণীয়াতে যুদ্ধযাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন। শোকৎ জঙ্গও নিজ সৈন্য সকল প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধবিষয়ে কিছুমাত্র জানিতেন না, এবং কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার সেনাপতিরা সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইয়া এক দৃঢ় স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানের সম্মুখে এক ঝিল ছিল, কেবল এক পথে তাহা পার হওয়া যাইত। সৈন্যেরা তথায় শিবির করিল, কিন্তু তাহাদের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ কেহ ছিল না, এবং যুদ্ধের নিয়মও নিরূপিত হয় নাই; অতএব সেনাপতিরা প্রত্যেকে যে২ স্থান ভাল বুঝিলেন, সেই২ স্থানে নিজ সৈন্য স্থাপন করিলেন। অবশেষে সেরাজ উদ্দৌলার সৈন্যেরা ঐ ঝিলের সম্মুখে আসিয়া শত্রুদিগের প্রতি কামান ছুঁড়িতে লাগিল; তাহাতে বৃহৎ কামানদ্বারা শোকৎ জঙ্গের সৈন্যদের কিঞ্চিৎ ক্লেশ জন্মিলে তিনি অবিচারে অশ্বারোহিদিগকে ঝিল পার হইয়া যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা অতিকষ্টে জল কর্দ্দমের মধ্য দিয়া গমন করিয়া শুষ্ক ভূমি পাইলে সেরাজ উদ্দৌলার সৈন্যগণ তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক আক্রমণ করিল। এই রূপে যুদ্ধের সংঘটন হইলে শোকৎ জঙ্গ স্ত্রীলোকদের সহিত ক্রীড়া করিতে তাম্বুতে গিয়া এমত মদ্যপান করিলেন যে ঘোড়ারপৃষ্ঠে বসিবার

শক্তি রহিল না। তথাপি তাঁহার সেনাপতিগণ আসিয়া সৈন্যদিগের অগ্রগামী হইতে তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া এক হস্তির পৃষ্ঠে বসাইলেন, পরে তাঁহার অবলম্বনরূপে এক দাসকেও বসাইয়া ঝিলের ধার পর্য্যন্ত আনাইলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যহইতে এক গোলা আসিয়া তাঁহার কপালে লাগাতে তিনি হাওদাতে পড়িয়া মরিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার মৃত্যু দেখিয়া শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। দুই দিবস পরে সুবাদারের সেনাপতি মোহন লাল পূরণীয়া হস্তগত করিয়া তথায় প্রাপ্ত প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা ও শোকত জঙ্গের রমণী সকল মুরশীদাবাদে পাঠাইলেন। সেরাজ উদ্দৌলা সেই যুদ্ধে গমন না করিয়া রাজমহলে রহিয়াছিলেন, তথাপি জয়েতে আত্মাভিমানী হইয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক মুরশীদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

এখন আমরা পুনরায় ইংরাজ লোকদের বিষয়ের বর্ণনা করিব। কলিকাতা শত্রুহস্তগত হওয়াতে তাহাদের সৌভাগ্য একেবারে নষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ড্রেক সাহেব স্বদেশীয় লোকদিগকে নিন্দনীয়রূপে পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজহইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতে দূত প্রেরণ করিয়া নদীমুখে সঙ্গি লোকদের সহিত জাহাজে থাকিলেন; তথায় তাঁহাদের মধ্যে পীড়াদ্বারা অনেকের মৃত্যু হইল;

কলিকাতায় যে বিপদ ঘটিয়াছিল তাহার সমাচার মান্দ্রাজে উপস্থিত হইবামাত্র তথাকার শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সভাসদ্ সকল চতুর্দ্দিগে বিপদ্ দেখিয়া অতিভীত হইলেন, কেননা তৎকালে তাঁহারা দিনে২ ফরাসিদের সহিত যুদ্ধের অপেক্ষাতে ছিলেন। তথাপি পণ্ডিচরিতে ফরাসিরা অতি বলবান্ এবং আপনাদের সৈন্য অতি

অল্প হইলেও বাঙ্গালায় প্রথমে সাহায্য করা কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহারা স্থির করিলেন. তাহাতে আদ্মিরল্ ওয়াট্‌সন সাহেব নাবিক সেনার, এবং কর্ণল ক্লাইব সাহেব স্থলচর সেনার অধিপতি হইলেন। তিনি তের বৎসর পূর্ব্বে আঠার বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পরে যোদ্ধার কর্ম্ম ভাল বাসাতে সৈন্যদলভুক্ত হইয়া মহাযোদ্ধারূপে বিখ্যাত হইলেন। বাঙ্গালায় আগমনের সময়ে তাঁহার বয়ঃ একত্রিংশ বৎসরমাত্র, কিন্তু যুদ্ধের নিপুণতা পরিপক্ব ছিল। মান্দ্রাজে সকলই প্রস্তুত করিতে অনেক কাল ব্যয় হওয়াতে ১৭৫৬ সালের আকটোবর মাসের পূর্ব্বে জাহাজ খুলিতে পারিল না, পরে উত্তর পূর্ব্ব বায়ু বহন করাতে জাহাজ দেড় মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হইল. এবং আর সকল জাহাজ আইলে পরে দুই খান অধিক বিলম্বে আইল। এই প্রকারে কলিকাতা নগর পুনরায় প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে নয় শত ইউরপীয় ও পোনেরো শত মান্দ্রাজদেশীয় সৈন্য প্রেরিত হইল। অপর ২০ ডিসেম্বর তাঁহারা ফল্‌তায় উপস্থিত হইলেন. এবং ২৮ তারিখে মায়াপুর পর্য্যন্ত আইলেন। সেই স্থানে মোগল লোকদের এক দুর্গ থাকাতে ক্লাইব সাহেব বাজিবেজো সমুদয় সৈন্য নামাইলেন, কিন্তু তথাকার পথদর্শকেরা তাঁহাকে বিপথে লইয়া যাওয়াতে দুর্গের নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সূর্য্যোদয় হইল। তাহাতে সুবাদারের সেনাপতি মাণিকচন্দ্র হঠাৎ কালিকাতাহইতে আসিয়া তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ যদি পুরুষত্ব প্রকাশ করিত, তবে ইংরাজেরা পরাজিত হইতেন, এমত বোধ হয়। কিন্তু ক্লাইব সাহেব অবিলম্বে বিপক্ষগণের

প্রতি কামান ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে এক গোলা মাণিকচন্দ্রের হাওদার মধ্যদিয়া যাওয়াতে তিনি ত্রাসযুক্ত হইয়া কলিকাতায় পলাইয়া গেলেন। এবং ভয়েতে সেই স্থানেও না থাকিয়া তাহার রক্ষার্থে পাঁচ শত সেনা রাখিয়া ত্বরায় মুরশীদাবাদে আপন প্রভুর নিকটে গমন করিলেন। ক্লাইব সাহেব স্থলপথে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহার উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে জাহাজীয় সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়া দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত কামান মারিয়া নগরকে পরাজয় করিয়াছিল। ১৭৫৭ শালের ২ জানুয়ারি তারিখে তাহা নাবিক সেনাপতির অধীন হইল। এই রূপে প্রায় মনুষ্যের প্রাণ নাশ বিনা কলিকাতা পুনর্ব্বার ইংরাজদের হস্তগত হইল।

১২ অধ্যায়।

অনন্তর নবাবকে ভয় প্রদর্শন না করাইলে তিনি কদাচ সন্ধি করিবেন না, ক্লাইব সাহেব ইহা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হওয়াতে কলিকাতার পুনঃপ্রাপ্তির দুই দিন পরে জাহাজ ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া তৎকালের প্রধান বাণিজ্যের ও ধনের স্থান যে হুগলী নগর তাহা হস্তগত করিলেন। অনুমান হয় তিনি কলিকাতার অধিকারী হইবামাত্র মুরশীদাবাদে লোক পাঠাইয়া সন্ধি করণার্থে ইংরাজদের ও নবাবের মধ্যস্থ হইতে তথাকার সেট লোকদিগের নিকটে নিবেদন করিয়াছিলেন। এবং সেরাজ উদ্দৌলা প্রথমে আনন্দ পূর্ব্বক তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এমত জনরবও আছে। যাহা হউক, ক্লাইব সাহেব তাঁহার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্থান অর্থাৎ হুগলী নগর হস্তগত করিয়া লুট করিয়াছেন, এই সমাচার পাইবামাত্র তিনি মহাক্রুদ্ধ

হইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় যাত্রা করিতে সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন। অপর ৩০ জানুয়ারি তারিখে তিনি পাঁচোয়ে হালসার নিকটে নদী পার হইয়া, ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ক্লাইব সাহেবের শিবির হইতে পাদক্রোশ দূরস্থ পথ দিয়া গমন করিয়া উক্ত নগরের পশ্চাৎ ভাগে শিবির স্থাপন করিলেন। তৎকালে ক্লাইব সাহেবের সাংগ্রামিক সাত শত ইউরোপীয় ও বারো শত দেশীয় সৈন্য ছিল, নবাবের সৈন্যসংখ্যা প্রায় চল্লিশ সহস্র লোক। সেরাজ উদ্দৌলার আগমন মাত্রে ক্লাইব সাহেব সন্ধি প্রস্তাব করণার্থে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তিনি সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সহিত বার বার ইংরাজ দূতগণের সাক্ষাৎ হইলে তিনি সন্ধির ইচ্ছা স্বীকার করিলেন, কিন্তু সে আন্তরিক নহে, ইহা স্পষ্ট ছিল। তাঁহার আগমনে কলিকাতার চতুর্দ্দিক্‌স্থ লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইয়া পলায়ন করাতে খাদ্য দ্রব্যের অভাবে ইংরাজদের ক্লেশ হইতে লাগিল, এই কারণ ক্লাইব সাহেব অবিলম্বে নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে আবশ্যক বুঝিয়া ৪ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে নাবিক সেনাপতির জাহাজে গিয়া তাহা হইতে ছয় শত নাবিক লোক লইয়া সেই রাত্রির দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে তাহাদের সহিত তীরে নামিলেন। পরে দুই ঘণ্টার সময়ে তাবৎ সৈন্যগণ সুসজ্জ হইয়া চারি ঘণ্টার সময়ে নবাবের শিবিরের প্রতি ধাবমান হইল। ক্লাইব সাহেবের নিকটে কেবল তের শত পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় ও আট শত দেশীয় সৈন্য ছিল, তথাপি তিনি তাহার বিংশতি গুণ অধিক সৈন্যকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন। প্রভাত সময়ে শীতানুকালের রীত্যনুসারে এমন ঘোরতর কুজ্ঝটিকা হইল, যে

কোন মনুষ্য স্বীয় হস্ত পর্য্যন্ত সম্মুখে দেখিতে পাইল না, তথাপি ইংরাজেরা শত্রুদের শিবিরমধ্য দিয়া যাইতে যাইতে যাহার সাক্ষাৎ পাইল তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে তাহাদের সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত বিংশতি সৈন্য হত কিম্বা ক্ষতবিক্ষত হইল, কিন্তু নবাবের তদপেক্ষা বহুগুণ ক্ষতি হইল, এবং তিনি তাঁহাদের এই রূপ সাহসযুক্ত আক্রমণ দেখিয়া অপরিমিত ভয় পাইলেন। তিনি যে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিলেন, তাহার দুঃসাহস দেখিয়া তৎক্ষণাৎ চারি ক্রোশ দূরে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এবং ক্লাইব সাহেব তাঁহাকে আর বার আক্রমণ করিতে উদ্যোগ প্রকাশ করিলে সেরাজ উদ্দৌলা যুদ্ধে মনঃপীড়া পাইয়া সন্ধি করিতে সম্মত হওয়াতে ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীকৃত হইল। সেই সন্ধিদ্বারা ইংরাজেরা পূর্ব্বমত সমস্ত ক্ষমতা পাইলেন। তাঁহাদের বাণিজ্য দ্রব্য দেশের সর্ব্বত্র পাঠাইতে শুল্ক রহিত হইল, এবং কলিকাতায় দুর্গ ও টঙ্কশালা নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি তাঁহাদিগকে দত্ত হইল। তদ্ভিন্ন নবাব তাহাদের হইতে অপহৃত সমস্ত দ্রব্য ফিরাইয়া দিতে এবং নষ্ট দ্রব্য সকলের মূল্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংরাজেরা যদ্যপি জয়ী হইয়াছিলেন, তথাপি এই সন্ধিতে নবাবের প্রায় কোন ক্ষতি জন্মিল না, তাহার কারণ এই, ইউরপে ফরাসিদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহা ক্লাইব সাহেব জ্ঞাত ছিলেন; এবং তাঁহার যত ইউরপীয় সৈন্য, চন্দননগরে ফরাসিদেরও তত সৈন্য ছিল। অতএব ফরাসিদিগকে আক্রমণ করণের পূর্ব্বে নবাবহইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে তাঁহার চেষ্টা ছিল।

ঐ উভয় দেশীয় লোকদের মধ্যে যুদ্ধের আরম্ভ হই-

আছে, ক্লাইব সাহেব ফরাসিদের নিকটে ভারতবর্ষে যুদ্ধ রহিত থাকিবার, অর্থাৎ পরস্পরের আক্রমণহইতে উভয় পক্ষের নিবৃত্ত থাকিবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে চন্দননগরের শাসনকর্তা উত্তর করিলেন, আমি আপনি এই প্রকার নিয়মে সম্মত আছি, কিন্তু আমা অপেক্ষা প্রধান কোন সেনাপতি যদি ফ্রান্স দেশহইতে আইসেন, তবে বোধ হয় তিনি অস্বীকার করিবেন। ইহাতে কোন স্থির নিয়ম স্থির করিতে পারা গেল না, এবং দক্ষিণদেশে যাবৎ ফরাসি লোকেরা এত সৈন্য রাখেন, তাবৎ কলিকাতার রক্ষা অসাধ্য, ইহা ক্লাইব সাহেব বুঝিলেন। অধিকন্তু সেরাজ উদ্দৌলা কেবল তাঁহাকে সঙ্কট করাতে সুযোগ পাইবামাত্র যুদ্ধ করিবেন, ইহাও তিনি জানিলেন; কারণ সেরাজ উদ্দৌলা ফরাসিদের সহিত নিত্য কুমন্ত্রণা করিতেন, এবং তাঁহাদের সাহায্যার্থে সৈন্যদলও পাঠাইয়াছিলেন; তথাপি ক্লাইব সাহেব নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহাদের বাসস্থান আক্রমণ করিতে চাহিলেন না, কিন্তু বার বার অনুমতি প্রার্থনা করিলেও কোন মতে পাইতে পারিলেন না। শেষে নাবিক সেনাপতি ওয়াটসন সাহেব নবাবের নিকটে পত্র লিখিয়া কহিলেন, আমি যে সকল সৈন্যের আগমনের অপেক্ষাতে ছিলাম, সে সকল আসিয়াছে; এখন তোমার রাজ্যে এমত যুদ্ধানল জ্বালাইব, যে গঙ্গার সমুদয় জলেও তাহা নির্বাণ হইবে না। ইহাতে সেরাজ উদ্দৌলা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া ১৭৫৭ শালে ১০ মার্চ তারিখে নম্রতা পূর্ব্বক এক পত্র লিখিলেন, তাহার শেষকথা এই, আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করিবেন। এই পত্রেতে ফরাসি লোকদিগকে আক্রমণ করিবার অনুমতি পাইলাম, ইহা বলিয়া ক্লাইব সাহেব

তৎক্ষণাৎ স্থলপথে সৈন্য সকলকে চন্দননগরে লইয়া গেলেন, এবং ওয়াট্‌সন সাহেবও আপনার অধীন জাহাজ সকল তথায় লইয়া গিয়া নগরের সম্মুখে লঙ্গর ফেলিলেন। ক্লাইব সাহেব আপনার ব্যবহারানুসারে পুরুষত্ব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু নগরের পরাজয় বরুণ্‌ সাহাজ্যদ্বারা হইল। তৎকালে যে রূপ যুদ্ধ হইল সেই রূপ তুমুল যুদ্ধ ভারতবর্ষে ইংরাজদের পূর্ব্বে হয় নাই। নয় দিন অবরোধ করিলে পরে সেই নগর তাঁহাদের হস্তগত হইল। চন্দননগরের পরাজয় বিশ্বাসঘাতকতাহইতে জন্মিয়াছিল, অর্থাৎ ইংরাজ লোকেরা ফরাসিদের সৈন্যগণকে কিম্বা সেনাপতিদিগকে উৎকোচ দিয়াছিলেন, এমত জনরবের উপর নাকি বার হইয়াছে। তাহার মূল এই, ইংরাজদিগের জাহাজ নিবারণার্থে ফরাসিদের শাসনকর্ত্তা অনেক নৌকা জলে মগ্ন করিয়া নদী প্রায় অগম্য করিয়াছিলেন, কেবল এক স্থানে সঙ্কীর্ণ পথ অবশিষ্ট ছিল, এবং তাহা কোথায়, ইহা অল্প লোক জানিত। তৎকালে ফরাসি সেনাপতিদের মধ্যে তেরাণো নামক এক জন সাহেব ছিলেন; তিনি কোন কারণে রেণো নামক গবর্ণর সাহেবের প্রতি বিরক্ত হওয়াতে ক্লাইব সাহেবের পক্ষ হইয়া ঐ পথ তাঁহাকে দেখাইলেন। তদবধি ইংরাজদের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়া তাহার কিয়দংশ বৃদ্ধ পিতার উপকারার্থে ফ্রান্সদেশে পাঠাইলেন; কিন্তু পিতা ঘৃণাপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতক পুত্রের উপকার অস্বীকার করাতে পুত্র মনোদুঃখে মগ্ন হইয়া নিজ বাটীর দ্বারে গাত্রমার্জ্জনী গলায় দিয়া আত্মঘাতী হইলেন।

ইংরাজেরা টঙ্কশালা ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইতে পূর্ব্বে যাইট বৎসর পর্য্যন্ত বৃথা যত্ন করিয়াছিলেন,

এবং তাঁহাদের যে পুরাতন দুর্গ শেষে অতি সত্বরেই নবাবের হস্তগত হইল, তাহার নির্ম্মাণ অতি গোপনরূপে হইয়াছিল। কিন্তু সেরাজ উদ্দৌলার সহিত সন্ধি সম্পন্নার্থে এ অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াতে ক্লাইব সাহেব অবিলম্বে এতদ্দেশীয় মহাজনদের [illegible] দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দিলেন এবং যে দুর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার নির্ম্মাণ ১৭৫৭ সালে আরম্ভ করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক সমাপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। [illegible] সেই দুর্গে কত মুদ্রা লাগিবে, তাহা জানা ছিল না। পরে নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে আবশ্যক অনুমান করিতে না পারাতে জানা গেল দুই কোটি টাকা ব্যয় হইল। উক্ত সনেতে টাকশালা প্রস্তুত হইলে ১৭৫৭ সালের ১৯ আগষ্ট কলিকাতার টাকশালার মধ্যে প্রথম ইংরাজী মুদ্রা অঙ্কিত হইল।

ক্লাইব সাহেব এই প্রকারে বলদ্বারা ইংরাজদের উন্নতি জন্মাইয়া বলদ্বারাই তাহা রক্ষা করিতে হইবে, ইহা স্পষ্ট দেখিলেন। এবং ইংরাজেরা বসিয়া থাকিতে পারিবেন না, অবশ্য তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাও প্রত্যয়সিদ্ধ বুঝিলেন। বিশেষতঃ ফরাসিরা যাহাতে পুনর্ব্বার বাঙ্গালাতে স্থান পাইতে না পারেন, এ বিষয়ে তিনি চেষ্টান্বিত হইলেন। তৎকালে ফরাসি লোকদের সেনাপতি বুসি সাহেব দক্ষিণ দেশের অনেক স্থান জয় করিয়া অত্যন্ত পরাক্রমী হইয়াছিলেন। সেরাজ উদ্দৌলা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিতে আশ্বাস দিলে তাঁহার এই রূপ কথা সম্বলিত কোন কোন পত্র ক্লাইব সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল। সেই সময়ে নবাব ইংরাজদের সহিত মৌখিক বন্ধুতা প্রকাশ করি-

তেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের এই দোষ তিনি ক্ষমা করিতে অসমর্থ ছিলেন, এবং তাঁহার কোপ পুনঃ পুনঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। এক দিন তিনি আপন সভায় ওয়াট্স সাহেবকে শূলে দিবার ভয় দেখান, পরদিন তাঁহাকে নূতন এক পরিচ্ছদ অর্পণ করেন। এবং এক দিন ক্রোধে ক্লাইব সাহেবের পত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন, পরদিন আবার তাঁহাকে অতি নম্রতা স্বীকার করিয়া পত্র লেখেন। এই দোষ সংযুক্ত থাকিলে যত কাল বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা থাকেন, তাবৎ আমাদের কোন মঙ্গল স্থির নাই, ইহা বুঝিয়া ইংরাজেরা স্বরক্ষা রক্ষার্থে কর্ত্তব্য কি, মনে২ তাহার আন্দোলন করিতেছিলেন, এমত সময়ে নবাবের অধ্যক্ষ সভাসদ্ তাহাদের নিকটে আপন আপন মনোদুঃখ প্রকাশ করিলেন। নবাবের অভিমান ও ক্রোধ প্রযুক্ত তাঁহারা প্রতি বিরক্ত হওয়াতে এবং ধন মান প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা পূর্ব্বৎসরে শৌকৎ জঙ্গকে রাজা দিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন; পরে সেই আশা বিফল হইলে কোন মতে সেরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করণার্থে একপ্রতিজ্ঞ থাকিয়া গুপ্তভাবে ইংরাজদের নিকটে দূত পাঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে সেরাজ উদ্দৌলা হইতে দেশের উদ্ধারার্থে হিন্দু জমীদারেরা ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, হিন্দুলোকদের মধ্যে এমত জনরব হইয়াছে, কিন্তু সে গল্পমাত্র। বর্দ্ধমান ও নবদ্বীপ ও রাজশাহী প্রভৃতি প্রদেশের জমীদারেরা কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, অতএব এই কর্ম্মে হস্তার্পণ করা তাঁহাদের অসাধ্য ছিল, এবং তাঁহারা যে সেই চক্রমধ্যে ছিলেন না, ইহা নিশ্চয়; নবাবের বণিক্ যে মহাপরাক্রান্ত শেট

বংশ, এবং সৈন্যসামন্তের ধনাধ্যক্ষ রায় দুর্লভ নামক সেনাপতি, এবং ওমীচাঁদ ও খোজা ওয়াজিদ নামক দুই ধনি বণিক, ইহাঁরা, সেরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার পদে মীর জাফরকে স্থাপনার্থে ইংরাজদের সাহায্য পাইতে ক্লাইব সাহেবকে আহ্বান করিলেন। ইংরেজেরা সাহায্য না করিলেও রাজ্যের বিপর্যয় হইবে, কিন্তু সাহায্য করিলে আমাদের ফল দর্শিবে, অতঃ ইংরাজেরা স্বীকারিলেন; তথাপি তাঁহাদের সভাসদ্ লোকেরা, অতি সাহসী না হওয়াতে এ মন্ত্রণাতে যুক্ত হইতে সন্দেহ করিলেন। বিশেষতঃ নাবিক সেনাপতি ওয়াটসন সাহেব বিদেশি ক্ষুদ্র বণিক লোকদের কেবল দেশের শাসনকর্ত্তাকে পদচ্যুত করা ভারি সন্দেহের কথা জ্ঞান করিলেন, কিন্তু ক্লাইব সাহেব অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসিক লোক ছিলেন, এবং দুঃসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইলে তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইত। তিনি এপ্রিল ও মে দুই মাস পর্য্যন্ত মুরশীদাবাদস্থ ওয়াট্স সাহেবদ্বারা নবাবের সভাসদ লোকদের সহিত ঐ মন্ত্রণার চালনা এমত গুপ্তভাবে করিলেন, যে সেরাজ উদ্দৌলা তাহা টের না পাইয়া কেবল এক বারমাত্র কোন সন্দেহ জন্মিলে মীর জাফরকে ডাকাইয়া কোরাণ স্পর্শে বিশ্বস্ত থাকিবার শপথ করাইলেন। সকলই প্রস্তুত হইলে ওমায়চাঁদের খলতাদ্বারা মন্ত্রণা বিফল হইবার সম্ভাবনা জন্মিল। সেই ব্যক্তির অধিক ধন এবং আরও অধিক লোভ ছিল। প্রাপ্তব্য লাভের বিংশতিতম অংশ তাঁহাকে দিবার কথা পূর্ব্বে স্থির হইলেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া এক দিন সন্ধ্যাকালে ওয়াট্স সাহেবের নিকটে আসিয়া কহিলেন, আমাকে আর ত্রিশ লক্ষ টাকা দেওনের অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া না দিলে এই নিমিষে সুবা-

দারের সমীপে গিয়া সমস্ত কুমন্ত্রণা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ওয়াট্স সাহেবের ও তন্মধ্যস্থ অন্যান্য সকলের প্রাণ যাইত, অতএব ওয়াট্স সাহেব মিষ্ট কথন-দ্বারা সেই বিশ্বাসঘাতককে শান্ত করিয়া বিলম্ব করাইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় ঐ সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। এই রূপ সমাচার পাইয়া ক্লাইব সাহেব উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং ওমায়চাঁদের এমত কুৎসিত উপায়দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা প্রযুক্ত তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের শত্রু জ্ঞান করাতে তাঁহার খলতা বিফল করণার্থে চাতুরী নিষিদ্ধ নহে, এমন বোধ করিয়া ওয়াট্স সাহেবকে ঐ প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে সন্ধিপত্রের দুই অনুলিপি প্রস্তুত করাইলেন, তাহার একের মধ্যে ওমায়চাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লিখিত হইল না, কিন্তু দ্বিতীয় অনুলিপিতে ঐ টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা লিখিত হইল। পরে এই দ্বিতীয় অনুলিপিমাত্র ওমায়চাঁদকে দেখাইলে তিনি ক্ষান্ত হইলেন। পরে ইংরাজদের সৈন্য যখন আসিবে, তখন মীর জাফর আপনার অধীন সমস্ত সৈন্যের সঙ্গে নবাবের সৈন্যসামন্তকে ত্যাগ করিয়া ইংরাজদের পক্ষ হইবেন, এমত নিয়ম স্থির হইল।

এই রূপে সকলই প্রস্তুত হইলে ক্লাইব সাহেব পত্র লিখিয়া, সেরাজ উদ্দৌলা ইংরাজদের প্রতি যে২ অন্যায় করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন, এবং তাঁহার প্রতি সন্ধিনিয়ম লঙ্ঘনের দোষ আরোপ করিলেন, বিশেষতঃ ইংরাজদের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার প্রতিজ্ঞানুযায়ি পরিশোধ তিনি করেন নাই, এবং ইংরাজদিগকে দূর করণার্থে ফরাসি লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহাও লিখিলেন। পত্রের শেষে কহিলেন, রাজসভাস্থ

প্রধান ব্যক্তিদের বিচারেতে এই সকল বিবাদ ভঞ্জনার্থে আমি আপনি মুরশীদাবাদে চলিলাম। এই রূপ পত্রে এবং ক্লাইব সাহেবের আগমন সংবাদে স্ববাদার উদ্বিগ্ন হইয়া সসৈন্যে পলাশী পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ক্লাইব সাহেব ১৭৫৭ শালের জুন মাসের প্রথমে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া ১৩ জুন কাটোয়াতে উপস্থিত হইয়া পরদিনে তথাকার দুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজয় করিলেন। অপর ১৯ তারিখে অত্যন্ত বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে তিনি নদী পার হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবেন কি ফিরিয়া যাইবেন, এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইলেন, কারণ মীর জাফরের কোন পত্র বা কোন চিহ্ন কিছুই পাইলেন না। অতএব তিনি সেনাপতিগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। তাহাতে যুদ্ধ করা অকর্ত্তব্য, তাঁহাদের এমত মন্ত্রণা হইলে তিনিও প্রথমে সেই বিচার ভাল জ্ঞান করিলেন; পরে আরো সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া, শেষে যাহা হউক, ইহা ভাবিয়া যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন; কেননা এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যদি ফিরিয়া যান, তবে বাঙ্গালাতে ইংরাজদের সকল বিষয় নষ্ট হইবে, ইহা তিনি বুঝিলেন। অতএব ২২ জুন সূর্য্যোদয় সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ নদী পার হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ণে চারি ঘণ্টার সময়ে সকলে পূর্ব্বতীরে উত্তীর্ণ হইয়া তদবধি অবিশ্রামে গমন করিতে করিতে রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে পলাশীর উপবনে উপস্থিত হইল। ২৩ তারিখে প্রভাত হইবামাত্র যুদ্ধের আরম্ভ হইল। ক্লাইব সাহেব ব্যগ্র হইয়া মীর জাফর ও তাঁহার সৈন্যগণের অপেক্ষাতে ছিলেন, কিন্তু তৎকালেও তাহাদের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। মীর জাফর সসৈন্যে সেই স্থানে ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ করিলেন না। নবাব স্তাবক লোকদ্বারা

বেষ্টিত হইয়া সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাতে তাম্বুমধ্যে রহিলেন। তাঁহার পোনেরো সহস্র অশ্বারূঢ় ও পঁয়ত্রিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল, এবং যুদ্ধে মীর মদন তাহাদের অগ্রগামী হইলেন। প্রায় দুই প্রহরের সময়ে এক কামানের গোলা মীর মদনের দুই চরণে লাগিয়া তাহা ছিন্ন করাতে তিনি নবাবের তাম্বুমধ্যে আনীত হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তখন নবাব অতিশয় শোকযুক্ত হইয়া, তাবৎ ভৃত্যেরা বিশ্বাসঘাতক, এমন অনুমান করিতে লাগিলেন। অতএব মীর জাফরকে আহ্বান করিয়া তাঁহার চরণে উষ্ণীষ রাখিয়া অতি নম্রতা পূর্ব্বক বিনতি করিলেন, তুমি আমার মাতামহকে স্মরণ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিয়া এই বিপদের সময়ে সাহায্য কর। তাহাতে জাফর বিশ্বাসী থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, অধিক বেলা হইয়াছে, সৈন্যগণকে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা করুন, কল্য আমরা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সৈন্য সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, এই সর্ব্বনাশজনক পরামর্শ নবাবকে দিলেন। তদনুসারে নবাবের সেনাপতি মোহনলাল প্রত্যাগমনের আজ্ঞা পাইলেন। তৎকালে তিনি ইংরাজদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে মগ্ন ছিলেন, তথাপি অনিচ্ছুক হইলেও সেই আজ্ঞা গ্রাহ্য করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রত্যাগমনদ্বারা সৈন্যেরা ভগ্নাশ হওয়াতে চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিলে ক্লাইব সাহেব অনায়াসে সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। অনন্তর সেরাজ উদ্দৌলা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া দুই সহস্র অশ্বারূঢ় লোকের সহিত সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আট ঘণ্টার সময়ে মুরশীদাবাদে উপস্থিত হইলেন। পরে সমস্ত সেনাপতি ও মন্ত্রিগণকে আপনার নিকটে আসিতে আজ্ঞা

দিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলে নিজ নিজ বাটীতে থাকিলেন, এবং তাঁহার শ্বশুরও তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। এই রূপে পুরীমধ্যে একাকী ও বন্ধুহীন হইয়া সমস্ত দিন যাপন করিলে পর তিনি হতাশ লোকের উপযুক্ত পরামর্শ করিয়া ঘোর রাত্রিকালে কতিপয় আচ্ছাদিত গাড়ীর উপরে নিজ পত্নী ও প্রিয় পাত্রগণকে আরোহণ করাইয়া তন্মধ্যে সুবর্ণ রত্নাদি লইয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহর সময়ে ভগবানগোলাতে পলায়ন করিলেন। সেই স্থানে ফরাসিদের সেনাপতি লা সাহেবের নিকটে যাইবার অভিপ্রায়ে নৌকারোহণ করিলেন, কেননা তিনি উক্ত লা সাহেবের নিকটে পত্র লিখিয়া পাটনাহইতে আসিতে নিবেদন করিয়াছিলেন।

পলাশীর এই যে যুদ্ধদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবি অবস্থার নিশ্চয় হইল, তাহাতে ইংরাজদের কেবল বিংশতি ইউরপীয় সৈন্য ও পঞ্চাশৎ এতদ্দেশীয় সৈন্য হত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে মীর জাফর ক্লাইব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিজয়ের নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া মুরশীদাবাদে যাত্রা করিলেন। অনন্তর মীর জাফর রাজপুরীকে আপনার বাসস্থান করিলে নগরের প্রধান লোকেরা ও রাজকীয় অমাত্যবর্গ তথায় একত্র হইলেন। তাহাতে রাজসভার মধ্যে ক্লাইব সাহেব আসনহইতে উঠিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মীর জাফরকে রাজসিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কএক জন ইউরপীয় ভদ্র লোক এবং ক্লাইব সাহেবের দেওয়ান রামচাঁদ এবং তাঁহার মুনসী নবকৃষ্ণ, এই সকলের সহিত ধনাগারে গেলেন, কিন্তু তথায় দুই কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ কিম্বা

রৌপ্য পাওয়া গেল না। ইহাতে তৎকালের ইতিহাস-লেখক কহেন, ঐ কেবল বাহ্য কোষ ছিল, তাহা ভিন্ন যাহার বিষয়ে ক্লাইব সাহেব কিছু জানিতে পারিলেন না, এমন আর একটি গুপ্ত কোষ অন্তঃপুরমধ্যে ছিল, তন্মধ্যে আট কোটি টাকার সুবর্ণ ও রৌপ্য ও রত্ন ছিল; এবং মীর জাফর ও ইমর বেগ খাঁ ও রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ এই কএক জন সেই ধন বণ্টন করিয়া আপনারা লইলেন, এমন কথাও তিনি বলেন। আর তাহা অসম্ভব নহে, কেননা যে রামচাঁদ মাসে ষাইট মুদ্রা বেতন পাইতেন, তিনি দশ বৎসর পরে সওয়া লক্ষ টাকা রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এবং নবকৃষ্ণ মুন্সীর ও মাসিক বেতন ষাইট টাকার অধিক না হইলেও তিনি অল্প কাল পরে রাজা নবকৃষ্ণ হইয়া মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন।

এই প্রকার ঘটনাদ্বারা ইংরাজদের বিপদের প্রতীকার হইয়াছিল। ১৭৫৬ শালের জুন মাসে তাঁহাদের বসতিস্থানের লুটপাট ও বাণিজ্যের রোধ ও প্রধান লোকদের নির্দয় হত্যা হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালাতে তাঁহাদের অবস্থিতি করিবার উপায়মাত্র অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু ১৭৫৭ শালের জুন মাসে তাঁহারা ঐ বসতিস্থান পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কেবল তাহা নয়; বরং তাঁহাদের প্রধান শত্রু সেরাজ উদ্দৌলাকেও পরাজয় করিয়া আপনাদের মনোনীত নবাবকে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের বিপক্ষ ফরাসি লোকেরাও বাঙ্গালাহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের ক্ষতির প্রতীকারার্থে মুরশীদাবাদস্থ ধনাগারে সঞ্চিত মুদ্রার বিভাগ করণের এই নিয়ম স্থির হইল। সরকারি বিষয়ের ক্ষতির নিমিত্তে কোম্পানিকে এক কোটি টাকা, এবং কলিকাতার পরাজয়-

দ্বারা যে ইংরাজ লোকদের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল তাঁহাদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ, এবং এতদ্দেশীয় লোকদিগকে বিংশতি লক্ষ, ও আরমানি লোকদিগকে সাত লক্ষ টাকা দিতে স্থির হইল। তদ্ব্যতিরেকে নাবিক ও স্থলচর সৈন্যদিগকে অধিক পারিতোষিক দত্ত হইল। এবং যে সকল প্রধান লোকেরা মীর জাফরকে রাজ্যপ্রাপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও উপেক্ষা হইল না। ক্লাইব সাহেব ষোল লক্ষ টাকা পাইলেন, এবং অন্যান্য সভাসদ লোক আপন আপন অংশ পাইলেন। অধিকন্তু পূর্ব্বে ইংরাজদের যে সকল ক্ষমতা ছিল, ইহার পরেও তাহা থাকিবে, এবং মারহাট্টাদের পরিখার মধ্যে ও তাহার বাহিরে বারো শত হস্ত পর্য্যন্ত সমুদয় ভূমি তাঁহাদের হইবে, এবং কলিকাতার দক্ষিণস্থ দেশের কুল্পি পর্য্যন্ত জমীদারী কোম্পানির হইবে, এবং ফরাসিরা আর কখনও বাঙ্গালায় বসতি করিতে পাইবে না, এই সকল নিয়মও স্থির হইল।

সেরাজ উদ্দৌলা ভগবান গোলাহইতে প্রস্থান করিয়া যখন রাজমহলে উপস্থিত হইলেন, তখন পত্নীর ও কন্যার আহারার্থে পাক করিতে নামিয়া এক ফকীরের আশ্রমে গমন করিলেন। সেই ফকীর পূর্ব্বে তাঁহাকর্তৃক উপকৃত হওয়াতে তৎক্ষণাৎ গিয়া তাঁহার অন্বেষণকারি লোকদিগকে সংবাদ দিল, তাহাতে তাহারা আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে লোকদের সহিত তিনি আলাপ করিতেন না, তাহাদের নিকটে তখন অত্যন্ত বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার রোদন না মানিয়া সমস্ত স্বর্ণ রত্নাদি হরণ করিয়া পুনর্ব্বার মুরশীদাবাদে তাঁহাকে লইয়া গেল। সেরাজ উদ্দৌলার ঐ নগরে আনীত হওন কালে মীর জাফর নিজ ব্যবহারানুসারে অধিক পরিমাণে

আফিম খাইয়া নিদ্রাতে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু মীরন নামক তাঁহার যে পুত্র তৎকালীয় লোকদের মধ্যে দুষ্টতম ছিলেন, তিনি সেরাজ উদ্দৌলার আগমন সংবাদ শুনিয়া নিজ গৃহের নিকটে তাঁহাকে বদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা দিলেন। এবং দুই এক ঘণ্টার পরে আপনার বন্ধুদিগকে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে বধ করিতে আশ্বাস দিলেন, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকে অস্বীকার করিল। অবশেষে আলি বর্দির প্রতিপালিত মহম্মদী বেগ নামে এক দুরাত্মা ঐ দুষ্কর্ম্ম স্বীকার করিল; সেই ব্যক্তি হতভাগ্য রাজার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া খেদোক্তিতে কহিলেন, হায়, হুসেন কুলি খাঁর বধের প্রায়শ্চিত্তার্থে আমার প্রাণ যায়। ইহা কহিবামাত্র ঐ ঘাতক খড়্গ চালাইয়া পুনঃ পুনঃ আঘাতদ্বারা তাঁহাকে ছেদন করিল। প্রাণবিয়োগের সময়ে তিনি কহিলেন, এইক্ষণে হোসেন কুলির বধের প্রতীকার হইল। এই রূপে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার শরীর খণ্ডবিখণ্ড হইয়া বিনা সম্মানে গজপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইয়া, নগরের লোকাকীর্ণ পথ দিয়া কবরস্থানে নীত হইল। ঐ সময়ে মনোযোগের যোগ্য এক ঘটনা হইল, হস্তিপক কোন কারণে কিয়ৎ কাল হস্তিকে স্থগিত রাখিলে যে স্থলে অষ্টাদশ মাস পূর্ব্বে সেরাজ উদ্দৌলার দ্বারা হোসেন কুলি খাঁ হত হইয়াছিলেন, সেই স্থলে ঐ হস্তী দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাতে তিনি যে স্থানে নির্দ্দোষের রক্তপাত করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার খণ্ডাশ্রিত শরীরহইতে বিন্দু বিন্দু কিছু রক্ত ভূমিতে পতিত হইল।